২৬৯

সাক্ষরতা বুলেটিন

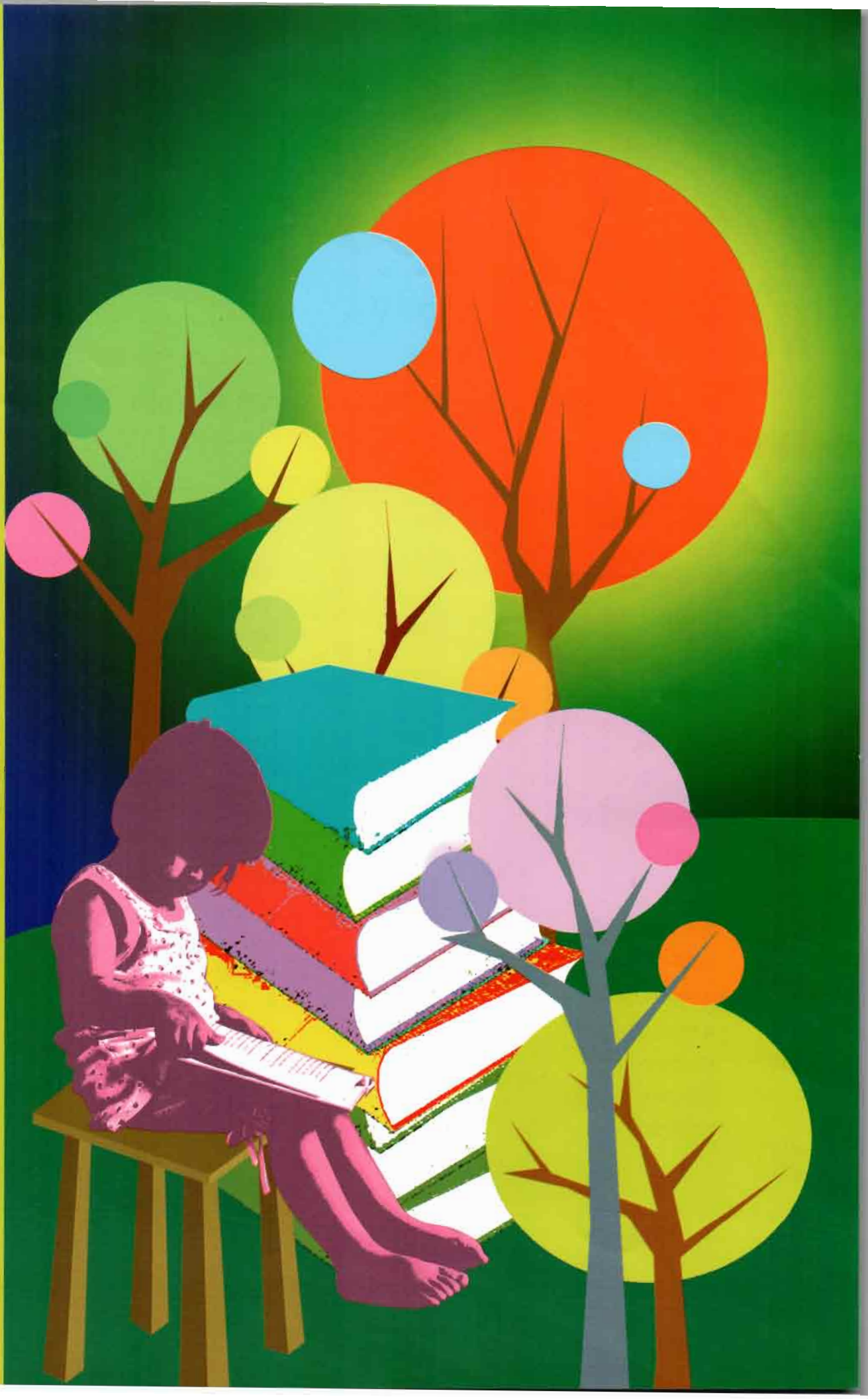

কার্তিক ১৪২৩
অক্টোবর ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৬৯ কার্তিক ১৪২৩ অক্টোবর ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূচিপত্র

৩ **শফিউল আলম**
বঙ্গবন্ধু শিক্ষাভাবনা

৬ **মোঃ আব্দুল আজিজ মুন্সী**
বিশ্ব খাদ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন দিবস এবং বাংলাদেশ

৯ **ড. খ.ম. রেজাউল করিম**
বিশ্ব শিক্ষক দিবস ও বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ

১২ **প্রফেসর ড. গোলাম সামদানী ফকির ও ম.মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া**
আরবিটি পদ্ধতি : প্রশিক্ষণ কার্যকরণে এক নবতর উদ্যোগ

১৫ **মোঃ মিজানুর রহমান আখন্দ**
তরুণ-তরুণীদের বিপথগামিতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা

১৮ **মোঃ মিজানুর রহমান**
উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী

২১. **মাহমুদ হাসান রাসেল**
শিশুবান্ধব শুভসূচনা

২৪. **কন্যাশিশুর অগ্রগতির জন্য চাই পর্যাপ্ত তথ্য**

২৫. **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা**

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

শ ফি উ ল আ ল ম

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের একটি প্রজ্ঞাময় উজ্জ্বল কাব্যে সমস্ত বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ নির্দেশনা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু:'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে একটি সার্বভৌম বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ঘোষণাই শুধু এখানে উচ্চারিত হয়নি, এ বাক্যের আরেকটি অমোঘ সারসত্য বাণী ছিল বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি। এ মুক্তি যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, তেমনি অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি। একটি জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে তার গঠনে নিয়ামক হল শিক্ষা। তাই শিক্ষককে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালির দুঃখ বঞ্চনার জন্য যিনি নিজের সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছিলেন তিনি কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই পাকিস্তানের পার্লামেন্টের এক বৈরি পরিবেশে বাংলা, বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বাংলার মানুষের শিক্ষার কথা বার বার বলে আসছিলেন।

১৯৭০ সালের যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হয়, সেই নির্বাচনের আগে তিনি বেতার-টেলিভিশনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে এদেশের তথা তৎকালীন নিপীড়িত পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার একটি সার্বিক চালচিত্র তুলে ধরে ছিলেন। তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাখাতে যদি পুঁজি বিনিয়োগ করা না যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই নির্বাচনী ভাষণে তাই তিনি বলেছিলেন-

সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুর এ উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে আমাদের এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্র জাপান ও কোরিয়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পে এবং অর্থনীতিতে শীর্ষে নিয়ে যায়। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই। বঙ্গবন্ধু এও জানতেন পাকিস্তানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার হার যেমন দিন দিন কমতে শুরু করেছে, তেমনি শিক্ষিতের হারও ক্রমাগত দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই এ ভাষণে তিনি বলেন,

১৯৪৭ সালের বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এটা ভয়াবহ সত্য।

আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর দশ লক্ষেরও অধিক লোক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

তাই বঙ্গবন্ধু মনে করেছেন। 'জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।' ১৯৭০ সালের সে ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু 'প্রাণমুখী' শিক্ষার ঘোষণা দেন। জনগণের জন্য যে শিক্ষা, দেশের সর্বসাধারণের জন্য যে শিক্ষা, দেশের সব মানুষকে সাক্ষর করার জন্য যে শিক্ষা তাই হলো 'গণমুখী শিক্ষা'। বঙ্গবন্ধু সেই গণমুখী শিক্ষার স্বপ্ন এখন পরিচিতি লাভ করেছে 'গণশিক্ষা' বা Mass Education নামে। পরবর্তী কালে সরকার এ নামে একটি মন্ত্রণালয়ও গঠন করেছে- যার নাম 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে যে 'লোকশিক্ষা'-র কথা ভেবেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন-

'শিক্ষা বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের লক্ষ্য।.....দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুকরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলো পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই।'

'গণমুখী অধিকার'-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শিক্ষার আলো দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেওয়ার কথাই ভেবেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নভাবনা তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে-

আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

খাদ্য ও বাসস্থানের পর বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে শিক্ষাবিষয়ক অধিকার দিয়ে উন্নত জীবনের অধিকারী করতে চেয়েছিলেন। তাই সদ্যস্বাধীন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জাতির জনক বাঙালি জাতিকে ১৯৭২ সালে উপহার দিলেন একটি 'সংবিধান'। সংবিধানে চারটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করলেন এই ভাবে-

রাষ্ট্র

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি জন্য,

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯৭২ সালের বঙ্গবন্ধুর এই শিক্ষাভাবনাই পরবর্তীকালে Total Literacy Movement (TLM) বা সর্বজনীন সাক্ষরতা আন্দোলন-এ রূপ পেয়েছে, ভারতবর্ষে যার নাম সর্ব সাক্ষরতা আন্দোলন। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষ দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকারকে বঙ্গবন্ধু প্রথম নিশ্চিত করেন সংবিধানে। এবছরই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৬ শে জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠন করেন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি পুনর্গঠিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে কমিশনে শিক্ষার এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করেন যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে।'

১৯৭৩ সালের ৮ জুন এই কমিশনে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট ও ৩০ মে ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট নতুন একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন-

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক।

বর্তমান সরকার ২০১০ সালে যে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছে তা মূলত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকেই প্রণীত। সার্বভৌম বাংলাদেশে এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার প্রতিফলন ঘটলে নতুন ও সর্বপ্রথম ও প্রায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এই বাংলাদেশে শিক্ষানীতিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের আর্থিক দুরাবস্থা, তাদের বেতন ভাতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 'শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষকদের জন্য একটি পৃথক বেতন-স্কেলের কথাও ঘোষণা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শুধু যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন তা নয়, তিনি দেশের ৩৬,১৬৫টি(ছত্রিশ হাজার একশত পয়ষট্টি) প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন এবং যে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সামান্য বেতনটুকু কখন পাবেন তা নিশ্চিত ছিল না, সে-সময় তিনি সে দেশের ১,৫৭,৭৪২ (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) জন শিক্ষককে

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সরকারি তহবিল থেকে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে সময় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নতুন ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও। অন্যদিকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। অন্য দিকে মুসলমান ব্যতীত দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম শিক্ষার উন্নয়নের জন্যও গুরুত্ব দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে এদেশের সরকারি কলেজে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের চাকুরি স্থায়ীকরণ ও বেতনের নিশ্চয়তার ওয়াদা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এসব এডহক কলেজ শিক্ষকদের চাকুরি নিয়মিত করে তাঁর ওয়াদাই শুধু পালন করেননি তিনি সরকারি কলেজ শিক্ষকদের জীবনের অনিশ্চয়তাও দূর করেন।

বঙ্গবন্ধুই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ রাষ্ট্রীয় কার্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি স্থাপিত হয়। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন সুপারিশ এক ও অভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানসম্মত, জীবনমুখী, সমাজ, পরিবেশ ও চাহিদাভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের যে সুপারিশ খুদা-কমিশনে এসেছে তাতে বঙ্গবন্ধুর হাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৭-১৯৭৮) গৃহীত হয়।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। তাই শিক্ষার পাশাপাশি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চায়ও তিনি উৎসাহ দিতেন। একটি অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চেতনায় উদ্দীপ্ত শিক্ষিত সমাজ-গঠনে এদেশের নব প্রজন্মর শিশু-কিশোরদের উৎসাহ যোগাতে ছুটে যেতেন তিনি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি চেতনা ও খেলাধুলাকেও তিনি দিতেন সমান গুরুত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০-এর নির্বাচন পূর্ববর্তী ভাষণে, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের প্রতিকূল পরিবেশে বাংলা ও বাঙালি জাতির হয়ে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাই তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর স্বপ্ন পরিসর (১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫) কর্মজীবনে এ স্বপ্ন ও ভাবনার যে রূপায়ণ একটি ক্ষত-বিক্ষত, যুদ্ধশেষে বিধ্বস্ত দেশে করেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। তাই শিক্ষার পাশাপাশি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চায়ও তিনি উৎসাহ দিতেন। একটি অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চেতনায় উদ্দীপ্ত শিক্ষিত সমাজ-গঠনে এদেশের নব প্রজন্মর শিশু-কিশোরদের উৎসাহ যোগাতে ছুটে যেতেন তিনি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি চেতনা ও খেলাধুলাকেও তিনি দিতেন সমান গুরুত্ব।

তথ্যসূত্র

১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট: বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, নভেম্বর, ১৯৯৬, ঢাকা

২. শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ: মোনায়েম সরকার, মিনার মনসুর ও কুমার প্রীতিশ বল সম্পাদিত: আগামী প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা

৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এলবাম প্রকাশনা ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, আগস্ট ১৯৯৭।

অধ্যাপক শফিউল আলম
প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ

মোঃ আব্দুল আজিজ মুন্সী

বিশ্ব খাদ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন দিবস এবং বাংলাদেশ

প্রতিবছর একটি বিশেষ স্লোগানকে সামনে নিয়ে সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়। ১৬ অক্টোবর হল বিশ্ব খাদ্য দিবস। 'জলবায়ু বদলাচ্ছে, খাদ্যে ও কৃষিকেও বদলাতে হবে'- এই স্লোগান সামনে নিয়েই ২০১৬ সালে নানা আয়োজনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের অংশ হিসেবে সরকারিভাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জোট - 'খাদ্য অধিকার' র‍্যালী, জমায়েত ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। খাদ্য অধিকারকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবীতে গাইবান্ধা শহরে কৃষক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা পালিত হয়েছে। (*প্রথম আলো*, অক্টোবর ১৬, ২০১৬)।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সারা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা দূরীকরণের সম্মিলিত সংগ্রামের স্বীকৃতি হলো এই বিশ্ব খাদ্য দিবস। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির বিজ্ঞানী ড. প্যল রোমানি বিশ্বব্যাপী খাদ্য দিবস পালনের প্রস্তাব করেন। তারপর থেকে অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী ' বিশ্ব খাদ্য দিবস ' হিসেবে এই দিবসটি পালন করা হয়ে আসছে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস এর পরের দিন অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর ছিল 'বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন দিবস'। খাদ্য ও দারিদ্র একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত।

প্রতিটি জীবদেহে শক্তির বড় উৎস হলো খাদ্য। তাই প্রতিটি জীবই খাদ্য গ্রহণ করে। মানুষ নিজেকে সকল সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে দাবী করে। প্রাণ ধারণের জন্য প্রতিটি জীবের মত আমাদেরকেও খেতে হয়। খাদ্য মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এই অধিকার পূরণে মানুষকে খাদ্যপণ্য উৎপাদন করতে হয়। আমরা যে সব পণ্য আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করি, যা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে সেগুলোকে খাদ্যপণ্য বলে থাকি। এই সকল খাদ্যপণ্য মানুষ নিজেই উৎপাদন করে। অন্যান্য জীব নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ নিজেই খাদ্যপণ্য উৎপাদন করে। মাছ, মাংস, ডাল, দুধ, ভাত, রুটি, ফল-সবজি এই সকল খাদ্য মানুষ নিয়মিত খেয়ে থাকে এবং এগুলো উৎপাদন করতে পারে। মাছ, মাংস বা ডাল, দুধ, ভাত বা রুটি, ফল-সবজি, এই সকল খাদ্য পরিমিত পরিমাণে আমাদের প্রতিদিনের খাবারে থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। জৈবিক-প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক, আচার-অনুষ্ঠান, আয়-উপার্জন ও কাঠামোগত বিবিধ কারণে আমাদের দেশে ভাত প্রধান খাদ্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। তবে ভাত খাওয়ার জন্য শুধু চাল চিবিয়ে/সিদ্ধ করে খাওয়া যায় না। আরও অনেক কিছু প্রয়োজন হয়। ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, হলুদ, জিরা মসলা, তেল, লবণ আরও কত কি প্রয়োজন তা যারা খাবার তৈরী করেন বা রান্না-বান্না করেন তারা ভাল জানেন। এগুলো প্রতিদিনের খাবারে কম বেশী প্রায়

সবই প্রয়োজন হয়। এক কেজি চাল এর ব্যবস্থা করেই শুধু ভাতের আশা করা যায় না/ বা ভাত খাওয়া যায় না। এক কেজি চালের সমমূল্যের চেয়ে বেশী পরিমাণ খরচ হয় নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের জন্য। যেমন: তরকারি বা খিঁচুড়ির জন্য ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, হলুদ, জিরা মসলা, তেল, লবণ, জ্বালানির দরকার হয়। তাই তো কোরবানির বা পূজা পার্বণ ছাড়াও মানুষ থলে হাতে এগুলো কেনার জন্য বাজারে ছোটাছুটি করে। যাদের ঘরে চাল বা ধান আছে অর্থাৎ সারা বছর ঘরের চালের ভাত খায়, চাল কিনতে হয় না, তাদেরও থলে নিয়ে বাজারে যেতে হয়। তবে হুকুম করলেই বা যথাসময়েই যাদের টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে থাকে তাদের জন্য এই বিষয়টি বোঝা মুস্কিল। খাদ্য পণ্যের দাম বাড়লে তাদের তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত, দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য মরিচের দাম কেজিতে একটাকা বৃদ্ধি পেলেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা অবস্থা হয়ে যায়। কারণ তাদের সব কিছু কিনে খেতে হয়। খাদ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিবারের বাড়তি খাবার চাহিদা মেটাতে পারে না। খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার অভাবে শিশু ও মায়েরা অপুষ্টিতে ভোগে। শিশুদের লেখাপড়ায় মনোযোগ থাকে না। শিশুদের লেখাপড়ার উপর খারাপ প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে পরিবারের মেয়ে শিশুটির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে অনেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও তাঁদের নিকট তা বোধগম্য হয় না।

বাংলাদেশ ধান ও চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে কিন্তু খাদ্যপণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ খাদ্যপণ্য বলতে চাল, আটা, ময়দা, ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, হলুদ, জিরা মসলা, তেল, চিনি, ডিম, দুধ, লবণ সবই বুঝায়। এই সবই আমাদের সাধারণ খাদ্যসামগ্রী। আমরা কি এর সবগুলোতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ প্রচলিত ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে জমিতে ধান উৎপাদন হতো। মুগল শাসনামলে মোটা চালের গড় মূল্য টাকায় ৩০০ কেজি ছিল বলে জানা যায় এবং দীর্ঘকাল প্রায় এই মূল্যই স্থিতিশীল ছিল। জমিতে শুধুমাত্র ধান চাষ করা হতো না। পাট, আখ, তিল-সরষে ও ডাল-জাতীয় পণ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতো। আস্তে আস্তে দেশে সবজি চাষের প্রবণতা বাড়তে থাকে। এই অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আমাদের দেশের কৃষিখাতের উপর অনেক প্রভাব পড়েছে। জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদিত হচ্ছে। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে দেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন তিন গুণের বেশী বেড়েছে। মানুষ শুধু বর্তমানের কথা ভাবে না-বর্তমানের ক্ষুধা পূরণ করে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, সঞ্চয় করার জন্য কাজ করে। কিন্তু প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি তৈরী হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট খরা ও বন্যায় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। তাছাড়া কিছু মানুষের দ্বারা তৈরীকৃত দুর্যোগ যেমন খাদ্যপণ্যের মুল্য বাড়ানো, মজুদদারী, আবাদি জমি নষ্ট করা, তেল ও সারের মূল্য বৃদ্ধি, সার ও খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশানো, কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মুল্য কম দেয়া, দুনীর্তি ইত্যাদি খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে জমিতে বীজ বপন ও পর্যাপ্ত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে কৃষকদের ক্ষমতায়ন, পশুসম্পদের কার্যকর পরিচর্যা ও মৎস্য আহরণপূর্বক তাদের উৎপাদিত এ খাদ্য যেসব মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা। কাজেই দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াও মানুষের দ্বারা তৈরীকৃত দুর্যোগ খাদ্য নিরাপত্তার বড় হুমকি।

বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম প্রতিনিয়ত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশ বছরের মধ্যে এই দাম বেড়ে প্রায় দ্বিগুণের বেশী হয়েছে। তারপরও থেমে নেই। কোন পণ্যের দামই স্থিতিশীল পর্যায়ে নেই। দিন দিন বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্তমানে কোন খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, রাস্তাঘাট বন্ধ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের ইচ্ছাই যথেষ্ট। খাদ্যপণ্যের মূল্য বাড়তে বাড়তে এখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। এভাবে খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত মূল্যের অস্থিরতা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। ২/১ দিনের মধ্যে যারা বাজার করেছে তারা দেখেছে যে চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও ডিমের দাম বেড়েছে। দাম বেড়েছে বেশীর ভাগ সবজির। সবজির দাম কেজি প্রতি ৫০-৭০ টাকা। ১৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মালিবাগ কাঁচাবাজারে বরবটি ৮০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৬০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, কাকরোল ৫০ টাকা, কাচাঁ মরিচ ১৬০ টাকা, শসা ৬০-৭০, শিম ১২০-১৪০ টাকা, ফুলকপি ৪০-৬০ টাকা, বাঁধাকপি ৩০-৪০ টাকা কেজিতে, লাউ প্রতিটা ৬০-৭০ টাকা এবং শাক ২০-২৫ টাকা আঁটিতে বিক্রি হচ্ছে। (প্রথম আলো, অক্টোবর ১৬, ২০১৬)। চাল, ভোজ্যতেল, চিনি, ডিম, আঁদা-রসুন, সবজির এই অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির পিছনে যে সমস্ত কারণের কথা বলা হয়েছে তা কতটুকু যৌক্তিক তা সচেতন মহল ভালভাবে বলতে পারবেন। খাদ্যপণ্যের স্বল্পতার অজুহাত ও মূল্য বৃদ্ধির কাল্পনিক কান্ড-কারখানা মানুষ বুঝতে পারে। খাদ্যপণ্যের মূল্যে বৃদ্ধিকারী ব্যবসায়ীরা যেমন এই দেশে বসবাস করে-যারা ক্রেতা, যারা খাদ্যপণ্যে উৎপাদন করে- তারাও এই দেশেই বসবাস করে। দেশের আবহাওয়া এবং ফাঁক-ফোকর কোথায় তা সবই জানে।

বিগত কয়েক বছর হলো প্রায়শই দেখা যায় যে, কৃষক এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশে বাম্পার ফলন হয়েছে/হচ্ছে এবং মিডিয়াতে ফলাও করে তা প্রচারিত হয়। কৃষক আনন্দে চোখে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন ফসল কেটে বাজারে নিয়ে যায় তখন কৃষকের সেই স্বপ্ন ও হাসি আর থাকে না। তাঁদের উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। উৎপাদিত খাদ্যপণ্য অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। যেমন:

বোরো ধান চাষ করে উৎপাদন খরচের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম দাম পেয়েছে কৃষক। ফলে কৃষক বোরো চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় ২০ হাজার হেক্টর কম জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ এর লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ৪৬ লাখ ৬০ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে (প্রথম আলো, এপ্রিল ২৩, ২০১৬)। তবে কৃষকরা এর সুফল না পেলেও একশ্রেণির মজুদদাররা ঠিকই মুনাফা হাতিয়ে নেয়। এই চিত্র কাগজে, টিভির সংবাদে ছড়িয়ে পড়ে। যারা ধান, পাট, গম, আখ, সবজি উৎপাদনকারী- যারা ধান, পাট বেচা মানুষ তাদের দাবীতে রাজপথ উত্তেজিত হয় না। কারণ তারা ফসল উৎপাদনের রাজনীতি করে, পেট এর রাজনীতি করে, পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষনের রাজনীতি করে, শিশুদের লেখাপড়ার টাকার ব্যবস্থা করে। কৃষি কাজে জমি লাগে, বীজ লাগে, পানি লাগে, হাড়-ভাঙাখাটুনী লাগে- এগুলো নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত থাকে। সবকিছুর দাম বাড়ে কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ে না। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যটিই একসময় কৃষককেই বেশী দামে কিনে খেতে হয়। আবার আমরা মনের অজান্তে তাদের অনেক সময় 'চাষা' বলে গালি দেই। অথচ মধ্যযুগে এই কৃষকরাই অরণ্য, জলা ও পতিত ভূমিতে চাষাবাদ করে সভ্যতার পত্তন করেছিলেন। বিশেষ করে নারীরা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক বিরাট আবাদি সভ্যতা। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আজও আমাদের দেশের মোট জনশক্তির প্রায় ৬২ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত।

এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কিভাবে। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবা প্রয়োজন। যদিও দেশে কৃষি জমি কমে যাওয়ার পরও উন্নত জাত উদ্ভাবন করে খাদ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে, সরকারের নানা রকম উদ্যেগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকার কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে উপকরণ সহায়তা কার্ড দিয়েছে। কার্ডধারী কৃষকরাই খাদ্যগুদামে খাদ্যপণ্য সরবরাহ করবে। কিন্তু কৃষকদের কার্ড দিয়ে ব্যবসায়ী ও ফড়িয়ারা গুদামে ধান সরবরাহ করে। এতে ব্যবসায়ী ও ফড়িয়ারা লাভবান হচ্ছে (প্রথম আলো, জুন ২৩, ২০১৬)। দেশের কৃষিজমি ও বনাঞ্চল ধ্বংস করে শিল্পকারখানা গড়ে না তোলার জন্য সরকারিভাবে বার বার বলা হয়েছে এবং সারা দেশে নির্ধারিত ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে শিল্পকারখানা নির্মাণ এর কথা বলা হয়েছে। (প্রথম আলো, এপ্রিল ২০, ২০১৬)। দেশের কৃষি জমিকে কোনোভাবেই অকৃষি খাতে ব্যবহার করা যাবে না এ বিষয়ে আইন আছে। 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০১০' এবং 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন ২০১০' অনুসারে কৃষি জমি কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তারপরও কৃষি জমিতে কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকার দরিদ্র মানুষদের ১০ টাকা কেজি দরে চাল দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। শুরুতেই সেখানে দুনীর্তি শুরু হয়েছে। ডিলার নিয়োগ, কার্ড বিতরণ, চাল বিতরণ ব্যবস্থা সবক্ষেত্রে দুনীর্তি শুরু হয়েছে। সচ্ছল ও প্রবাসীদের কার্ড দেয়া হয়েছে। কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় ১০ টাকা কেজির চাল বিক্রির ডিলারশিপ নিয়োগে অনিয়ম ও প্রবাসী ও সচ্ছল পরিবারের সদস্যদের কার্ড দেয়া হয়েছে। (প্রথম আলো, অক্টোবর ১৬, ২০১৬)। সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলায় পাইকুরাটির ২ টি গ্রামের হতদরিদ্র ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। (প্রথম আলো, অক্টোবর ১৬, ২০১৬)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বিগত ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে দেশের জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন -২০১৩ অনুমোদন করেছে। তাছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন করে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্যপণ্যে উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্ণয় করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং গৃহীত উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌছানো এই কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু তারপরও কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে মেশানো হচ্ছে নানা রকম ভেজাল ও রাসায়নিক দ্রব্যে যা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। অভাবের সময় কৃষকদের কিনতে হচ্ছে এই সকল খাদ্যপণ্য। স্বচ্ছ ও ঝকঝকে চালে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক (আমাদের সময়. কম, এপ্রিল ২০, ২০১৬)। বেশী লাভের আশায় মোটা চালকে ছাটাই করে মিনিকেট নামে চাল বানানো হচ্ছে। আরও কত কি ! বর্তমানে শাকসবজি, মাছ-মাংস, ফলমূল এমনকি শিশুখাদ্য ও ঔষধে ভেজাল ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ খাদ্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এসকল বিষয় সমাধান করতে সকলের একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৫ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষের দৈনিক আয়ের প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ ব্যয় হয় চাল কেনায়। চালের দাম বাড়লে এ জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। দেশে তাদের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। মাত্র ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষ বসবাস করে। আমাদের ভূমি ক্ষুদ্র হলেও তা অত্যন্ত উর্বর, যার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু বদলাচ্ছে, খাদ্য ও কৃষিকেও বদলাতে হবে এবং আমাদের নিজেদেরকেও বদলাতে হবে। তবে দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করা সহজ হবে।

মোঃ আব্দুল আজিজ মুন্সী
উন্নয়ন কর্মী

ড. খ. ম. রেজাউল করিম

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ও বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ

ভূমিকা

সবার জন্য শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের স্থপতি হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ অক্টোবর সারা বিশ্বে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। সেই হিসেবে এ বছর এই দিনটির ২২ বছর পূর্ণ হলো। এ দিবসটির লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী শিক্ষকদের নৈতিক সমর্থন যোগানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদের মাধ্যমে কত যোগ্যতার সাথে তা মেটানো সম্ভব সেই নিশ্চয়তা বিধানে ভূমিকা রাখা। সারা বিশ্বে শিক্ষক সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান রেখে চলেছেন, ইউনেস্কো-এর মতে, বিশ্ব শিক্ষক দিবস সেই সচেতনতা, বোধগম্যতা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈশ্বিক উদযাপন।

শিক্ষক কে?

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। যিনি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন তিনিই শিক্ষক। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল স্তম্ভ হলেন শিক্ষক। একজন শিক্ষক হলেন আদর্শ মানুষ, অভিভাবক, নির্দেশদাতা, পরামর্শদাতা, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠার সময়ে শিক্ষককে সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য, মৌলিক ও অর্জিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পূর্ণ প্রয়োগ করতে হয় যাতে শিক্ষার্থী অনুকূল পরিবেশে তার আচার-আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়। মনোবিজ্ঞানের আলোকে একজন শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর সহজাত গুণাবলি এবং সম্ভাব্য শক্তির পরিমাপ করে শিক্ষার্থীকে সংবেদনশীল মন দিয়ে সাহায্য করেন।

আর শিক্ষকতা এমন এক মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ পেশা যা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর সহজাত গুণাবলি এবং সম্ভাব্য শক্তির পরিমাপ করে শিক্ষার্থীকে সংবেদনশীল মন দিয়ে সাহায্য করেন।

আর শিক্ষকতা এমন এক মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ পেশা যা উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

একজন শিক্ষকের দায়িত্ব কর্তব্য হলো: ক) শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো; খ) শিক্ষার্থীর মানস গঠনে সহায়তা করা; গ) শিক্ষার্থীর জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়া: ঘ) শিক্ষার্থীকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এক কথায় আগামী পৃথিবী যাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যথাযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে শিক্ষকরাই।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাপী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের সংগঠন এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে অচিরেই 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভের পাশাপাশি বিশ্বের সব দেশে একযোগে উদযাপিত হবে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে শিক্ষকদের মর্যাদার প্রশ্নটি বিবেচনায় নিয়ে ১৯৬৬ সালে আইএলও ও ইউনেস্কো-এর মধ্যে যে স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্রতিটি দেশ তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সম্মেলনে ইউনেস্কো ও আইএলও শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে একটি যৌথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে, যা শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক অবস্থানে নেয়াসহ শিক্ষকদের মৌলিক ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়া, পেশাগত স্বাধীনতা, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, দায়িত্ব ও অধিকার, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, কার্যকর শিক্ষাদান ও শিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মাইলফলক হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে ১০০টির বেশি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়। সেখানে একটি বিষয়ে সবাই ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান বিশ্বে শিক্ষকরা একটি ক্রমবর্ধমান জটিল, বহুসাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিনির্ভর দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে মেধা ও শ্রম দিয়ে চলেছেন। তাদের সেই অবদানের বিষয়টি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অন্যান্য পেশাজীবীরা যেন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তার ওপর গুরুত্বারোপের জন্য ইউনেস্কো ও এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল এই দিনটি উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতি বছর শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবদান তুলে ধরার জন্য এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল একটি জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালিয়ে থাকে।

এ বছর (২০০১৬) বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য হলো Valuing Teacher, Improving their Status অর্থাৎ শিক্ষকদের মূল্যায়ন হোক, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটুক। আজকের দিনের শিশু পরিপূর্ণ বয়সে কী পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে তার স্বরূপ এখনই ঠিকঠাক নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে না। তাই আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীর চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আজকের শিক্ষককে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সাথে একাধিক বিষয়ে পারদর্শি হওয়ার প্রয়োজন পড়ছে।

শিক্ষা সংকট

ইউনেস্কো-এর মতে, বর্তমান সারাবিশ্বে এক ধরনের শিক্ষাসংকট চলছে। প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শিশু শিক্ষার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অনেক দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে ১.৪ মিলিয়ন শ্রেণিশিক্ষক ঘাটতি রয়েছে। তার সাথে রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণের অভাব। ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের কাজটি শেষ করার ব্যাপারে ইউনেস্কো অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিশ্বব্যাপী ২০১৫ পরবর্তী শিক্ষাউন্নয়ন কর্মসূচি, যা প্রতিটি দেশকে বাস্তবায়নের জন্য ইউনেস্কো সুপারিশ ও সমর্থন যোগাবে, তা হলো:

- পেশা, পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ, উন্নত বেতন কাঠামোসহ চাকুরির সুবিধাজনক পরিবেশ;
- প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার উন্নত পরিবেশ;
- শিক্ষকদের জন্য উচ্চমানের প্রশিক্ষণ;
- শিক্ষক নিয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা;

তাদের প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দেশের সরকার সম্মিলিতভাবে কাজ করবে শিক্ষক ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে ব্যাপক সংখ্যক শিশু শিক্ষার বাইরে অবস্থান করে। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটসমূহের মূল কারণ, শিক্ষা সম্পর্কে গোটা সামজের দৃষ্টিভঙ্গি. এর সাথে আরো আছে বাণিজ্যিকীকরণের প্রশ্রয়, শান্তিহীনতার সংস্কৃতি, শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্য লোকের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষকদের অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষাপেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট অবগত আছেন। একটি দেশ স্বাধীনতা লাভের চার দশক পর একটি শিক্ষানীতি পেয়েছে। এই দীর্ঘ সময় এদেশের সামগ্রিক শিক্ষা কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির আলোকে পরিচালিত হয়নি। 'শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড' বলা হয়, কিন্তু তাকে দৃঢ় ও সোজা রাখতে এবং এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষকরা শুধু বেতন-ভাতা ও সুযোগ-

সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার তাই নয়, মর্যাদার প্রশ্নেও তারা অন্যান্য পেশাজীবি গোষ্ঠীর তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের শিকার। দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষকদের বঞ্চিত রাখার একটি সংস্কৃতি এ দেশে তৈরি হয়েছে। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের অবহেলা ও সমর্থন দুটোই রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(১) ধারায় বলা আছে: 'সমস্ত নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।' ১৯(২) ধারায় উল্লেখ আছে: 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" আবার এসডিজিতে শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য ৪-এ তে ৩০ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সরবরাহ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে শিক্ষক হিসেবে নয়, নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা কোথায়? রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের উচ্চ থেকে নিম্ন পদমর্যাদার নবীন কর্মচারী অল্পদিনেই ন্যূনতম সুদে গৃহসম্পদের মালিক হন। আর একজন প্রবীণ শিক্ষক সেই বাড়িতে ভাড়া থাকতে বাধ্য হন। শিক্ষকদের একথাও শুনতে হয়, আপনারা এই পেশায় এসেছেন মর্যাদার জন্য, অর্থের জন্য নয়। সেক্ষেত্রে বলা যায়, সম্পদ ও মর্যাদা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। আর যদি মর্যাদার কথাই বলা হয়, তাহলে তাও এই পেশার মানুষদের প্রদান করা হয়নি। রাষ্ট্রের 'ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'-এ সামরিক বাহিনীর একজন মেজরের অবস্থান কোথায় তা উল্লেখ থাকলেও একজন অধ্যাপকের পদমর্যাদা কী তার উল্লেখ নেই। এ উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি।

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষক

শিক্ষা যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ও টেকসই সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে শিক্ষকই হলেন প্রধান চালিকাশক্তি। একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানবসম্পদ। আর তা সৃষ্টি করে থাকেন শিক্ষকরা। এদেশের শিক্ষকরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে খুবই ন্যূনতম পেয়ে মাথা গুঁজে এই সম্পদ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। চাকুরি মানে শুধু বেতন-ভাতা নয়। সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও থাকতে হয়, যা চাকুরির অংশ। সেখানে শিক্ষকরা চরম বঞ্চনার শিকার। এমনকি একজন শিক্ষক অপমৃত্যুর শিকার হলে তার বিচার চেয়ে রাজপথে নেমেও সঠিক বিচার পাওয়া যায় না। এদেশের শিক্ষক সমাজবঞ্চিত এক শ্রেণি যাদের মর্যাদাবান বলা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। তারা সব ধরনের বস্তুতান্ত্রিক বৈষম্যের সুষ্ঠু সমাধান যেমন প্রত্যাশা করেন, তেমনি প্রাপ্য মর্যাদাও দাবি করেন, কারণ অন্যদের বুঝতে হবে যে কাউকে মর্যাদা দিলে অন্যের কম পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সব সম্মান আমার একার প্রাপ্য এমন ভাবনা রাষ্ট্রের জন্য শুভকর নয়।

উপসংহার

বিশ্ব শিক্ষক দিবস একটি দিবস শুধু নয়। সারা বিশ্বের শিক্ষক সমাজ একটি দিনে তাদের অবদান সম্পর্কে অন্যের মূল্যায়ন ও অভিব্যক্তি জানার পাশাপাশি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং তা পালন করতে নতুন করে সংকল্পবদ্ধ হবেন।

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' শুধু শিক্ষকদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের কথাই বলে না, বরং আগামী প্রজন্মের মানসম্মত শিক্ষার কথা চিন্তা করে শিক্ষকতা পেশাকে আরও আকর্ষণীয় এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের কথাও বলে। এ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শিক্ষক সমাজ তাদের অধিকার সুরক্ষা ও দায়িত্ব পালনের প্রত্যয় ঘোষণা করে। সেই সাথে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মানিত ও স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশা করতেই পারেন। ইউনেস্কো-এর মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের পাশে থেকে সমর্থন জোগালে তারা লক্ষ্যে পৌঁছাবেন বলে আশা করা যায়।

ড. খ. ম. রেজাউল করিম
সমাজ গবেষক ও শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা

(৫ অক্টোবর ২০১৬ খুলনা জেলায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়।)

প্রফেসর ড. গোলাম সামদানী ফকির ও ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া

আরবিটি পদ্ধতি : প্রশিক্ষণ কার্যকরণে এক নবতর উদ্যোগ

সময়ের বিবর্তনে প্রশিক্ষণ শুধু প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি আর মনোবৃত্তি পরিবর্তনের বিশেষ কোন প্রক্রিয়া নয়, প্রশিক্ষণ আজ মানব সম্পদ উন্নয়নের উন্নততর প্রযুক্তি। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা যেমন পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণও এক ধরণের উন্নতর প্রযুক্তি, যে প্রযুক্তি আপনার অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই প্রশিক্ষণ হতে দূরে থাকা সময়ের চাহিদাকে অস্বীকার করার সামিল। আপনার চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পেশাগত উন্নয়ন কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ আজ এক পরীক্ষিত হাতিয়ার; যে হাতিয়ার সময়ের চাহিদা পূরণে আপনার নিরন্তর সহযোগী। কোন দেশের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি। আর এই দক্ষ জনশক্তি সৃজনে প্রশিক্ষণ এক নবতর প্রযুক্তি। তাই প্রশিক্ষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং আরবিটি পদ্ধতি :

রেজাল্ট বেইস্‌ড ট্রেনিং বা RBT হচ্ছে একটি ফলাফল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পন্থা; যার মূল ললমঘ্য হল সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং লগ ফ্রেমে উল্লেখিত নির্দেশকের এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন। যাতে প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরিবর্তন (দৃশ্যমান কিংবা আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য) ও প্রশিক্ষণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; যা প্রকল্পের লগ ফ্রেমে উল্লেখিত নির্দেশকে দৃশ্যমান অবদান রাখে এবং প্রকারন্তে প্রকল্প লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা আরবিটি একটি পরিকল্পিত, চলমান অথবা সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, অভিঘাত এবং টেকসহিতা নিরূপণ করে। আরবিটি পদ্ধতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা থেকে এবং এ প্রক্রিয়া শেষ হয় প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে। আরবিটি পন্থাকে মোট চার ধাপে বিভাজন করা হয় এবং প্রতিটি ধাপ ক্রমানুসারে বাস্তবায়িত হয় এবং একটি ধাপ অপর ধাপের ওপর নির্ভরশীল থাকে। ধাপগুলো হলো যথাক্রমে,

১. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বা Plan

২. প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বা Process

৩. প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা চর্চা বা Practices

৪. প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন বা Post Evaluation -কে সংক্ষেপে আরবিটি 4P ফ্রেমওয়ার্ক বলা হয়। প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্থা বা প্রকল্পের লক্ষ্য এবং প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কোর্স ডিজাইন করা হলেও প্রকল্প লগ ফ্রেমে উল্লেখিত নির্দেশকে এটা কিভাবে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা থাকে না। তাছাড়া প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শিখণ ও শিক্ষণ প্রয়োগে যতোটা জোর দেয়া হয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগে চর্চার অনুকূল পরিবেশ বা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সহযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ততোটা জোর দেয়া হয় না। মূলত প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরিবর্তন ও প্রভাব কতটুকু পরিলক্ষিত হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রশিক্ষণ শিক্ষণ চর্চার ওপর, যার মধ্যে প্রশিক্ষণ ফলোআপ ও পরিবীক্ষণ, শিক্ষণ প্রয়োগে সহযোগী সম্পদ হস্তান্তর, মার্কেট লিংকেজ স্থাপন এবং প্রেষণা প্রদান এর অন্তর্ভুক্ত। আরবিটির ফ্রেমওয়ার্ক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

আরবিটি ধাপ	ধাপ ভিত্তিক কাজসমূহ	
ধাপ-৪: প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন (Post Evaluation)	নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন উন্নয়ন এবং সুপারিশমালার প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কিংবা প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার চর্চার ক্ষেত্রের অনুকূল পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তন আনয়ন।	↑
ধাপ-৩: প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ বা চর্চা	প্রশিক্ষণ পরবর্তী নিবিড় পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ, অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবায়নে পরামর্শ ও প্রেষণা প্রদান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি সেবা ও মার্কেট লিংকেজ স্থাপন এবং প্রাপ্যতা কিংবা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পদ হস্তান্তর।	↑
ধাপ-২: প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	টিএনএ জরিপ ও প্রতিবেদন উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ কোর্স নক্শায়ন ও উন্নয়ন (মডিউল), প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকরণ, ফলপ্রসূভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও চলমান প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের অঙ্গীকারনামা।	↑
ধাপ-১: প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা (Plan)	প্রশিক্ষণের অভিলক্ষ্য জনগোষ্ঠী বা দল নির্বাচন, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (টিএনএ) পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রশিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ সময়সূচি প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ রির্সোস ও পরিবেশ ঠিককরণ, প্রশিক্ষণ নিরাপত্তা বিবেচনা ও বাজেট প্রণয়ন।	↑

১. প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা : প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় লক্ষ্যভুক্ত প্রশিক্ষণার্থী কে বা কারা হবে এবং তাদের নির্বাচিত করার বৈশিষ্ট্যাবলী কি হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রশিক্ষণ চাহিদা (Training Needs) পর্বে প্রশিক্ষণ চাহিদার ধরণ বা প্রকার, চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি, দল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রশিক্ষণ কৌশল পর্যায়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, উপকরণ, প্রশিক্ষণ সময়কাল, মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, সুযোগ সুবিধা এ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়। প্রশিক্ষণ রিসোর্স পারসন নির্বাচন কৌশল যথা নিজস্ব প্রকল্প রির্সোস দ্বারা, বহিরাগত কারো দ্বারা নাকি দুটি কৌশলের সমন্বয়ে তা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ কৌশলে পাইলট টেস্টিং এবং প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ থাকে। এরপর প্রশিক্ষণ সিডিউল অর্থাৎ প্রশিক্ষণ সূচিপত্র তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষণ রির্সোস কে বা কারা তা নির্বাচন বা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় বর্ণনা করা এবং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ পূর্ব কি কি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিবেশ, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ নিরাপত্তা এবং সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ বাজেট এ জাতীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা আরবিটি'র একটি প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

২. প্রশিক্ষণ বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়া: আরবিটি'র ধাপ-২ প্রশিক্ষণ চাহিদা জরিপ পরিচালনা করা, জরিপের ভিত্তিতে টিএনএ প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশমালার আলোকে প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কোর্স ডিজাইন ও উন্নয়ন এবং পরিশেষে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। চলমান প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ।

৩. প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্থতা প্রয়োগ বা চর্চা : এই ধাপে প্রশিক্ষণ শিক্ষণ প্রয়োগের মাধ্যমে দৃশ্যমান পরিবর্তন এবং প্রশিক্ষণ প্রভাব নিশ্চিতকরণে নিবিড় ফলোআপ ও পরিবীক্ষণ, সহায়ক উপকরণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ হস্তান্তর, মার্কেট লিংকেজ এবং কারিগরি সেবা কিংবা প্রেষণা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। শেষ ধাপের কার্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারলে প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে সময় দৃশ্যমান পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রত্যাশিত অনুযায়ী অর্জন করা অনেকাংশে সম্ভবপর হয় না। তাই আরবিটি পদ্ধতি প্রশিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে এ ধাপকে সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দিয়ে থাকে।

৪. প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন : নির্দিষ্ট সময়ান্তে এর প্রশিক্ষণ 'মূল্যায়ন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন বলতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বা প্রকল্প অংশগ্রহণকারীগণ বাস্তবিক কর্মপরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট আইজিএতে কতটুকু প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন (দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান কিংবা আর্থিকভাবে পরিমাণযোগ্য) লক্ষণীয় তা বোঝানো হয়েছে। মূলত সংস্থার কর্মী ও প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভ্যাস প্রয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা ব্যক্তির কি কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং তা লক্ষ্য পর্যায়ে যেতে পারছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়। উল্লেখ্য যে, আরবিটি পদ্ধতি এর মূল্যায়ন (প্রশিক্ষণকালীন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী) অংশটুকু Kirkpatrick মডেল তথা 'ফোর লেভেল অব ইভালুয়েটিং ট্রেনিং রেজাল্ট' কে সমর্থন এবং অনুসরণ করে।

আরবিটি চারটি ধাপের মধ্যে যে চারটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে তার সংক্ষেপ রূপ হল প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, কার্যকর প্রশিক্ষণ পরিচালনা, চর্চা ও মূল্যায়ন।

আরবিটি চেইন :

প্রচলিত প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ইনপুট, আউটপুট এর ওপর জোর দিয়ে সাধারণত ইনপুট, প্রসেস/একটিভিটিজ নিয়ে কাজ করা হয়। এখানে প্রশিক্ষণ শিক্ষণ চর্চার পরিবেশ বা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সহযোগী পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় না। কিন্তু আরবিটি চেইন এ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব প্রদান করে।

আরবিটি চেইন এ ইনপুটস বলতে লক্ষিত দল (প্রশিক্ষণার্থীগণ), প্রশিক্ষক ও রিসোর্স পারসন, পাঠ্য উপকরণ (কোর্স রিডিং মেটেরিয়েলস অর্থে), প্রশিক্ষণ ভেন্যু, প্রশিক্ষণ বাজেট, কোর্স আউট লাইন, প্রশিক্ষণ এইড ও প্রশিক্ষণ ক্যাটালগ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ একটিভিটিজ কে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা প্রশিক্ষণকালীন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী। প্রশিক্ষণকালীন একটিভিটিজস বলতে টিএনএ সার্ভে ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, কোর্স উদ্দেশ্য নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ফরমেটিভ এ্যাসেসম্যান্টে (প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষণ মূল্যায়নকে বুঝানো হয়েছে), প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন, শিক্ষণ প্রতিফলন (লার্নিং রিফ্লেকশান), প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অঙ্গীকারনামা (পোস্ট ট্রেনিং কমিটমেন্ট) কে বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী

একটিভিটিজস এ প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ফলোআপ ও মনিটরিং, সহায়ক উপকরণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অনুসারে সম্পদ হস্তান্তর এবং সেটার নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানকে একটিভিটিজ এর আওতায় বিবেচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ আউটপুটস বা তাৎক্ষণিক ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ থেকে একটি নিদিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা, মনোভাব মূলত শিক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ আউটকামস বা মধ্যবর্তী ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ফলে প্রশিক্ষণার্থীর পরিবর্তন (দৃশ্যমান কিংবা আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য)-কে বুঝানো হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ইমপ্যাক্ট বা চূড়ান্ত ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণ পরিবর্তনের ফলাফল বা প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে। নিম্নে এক নজরে আরবিটি চেইন উপস্থাপন করা হলো:

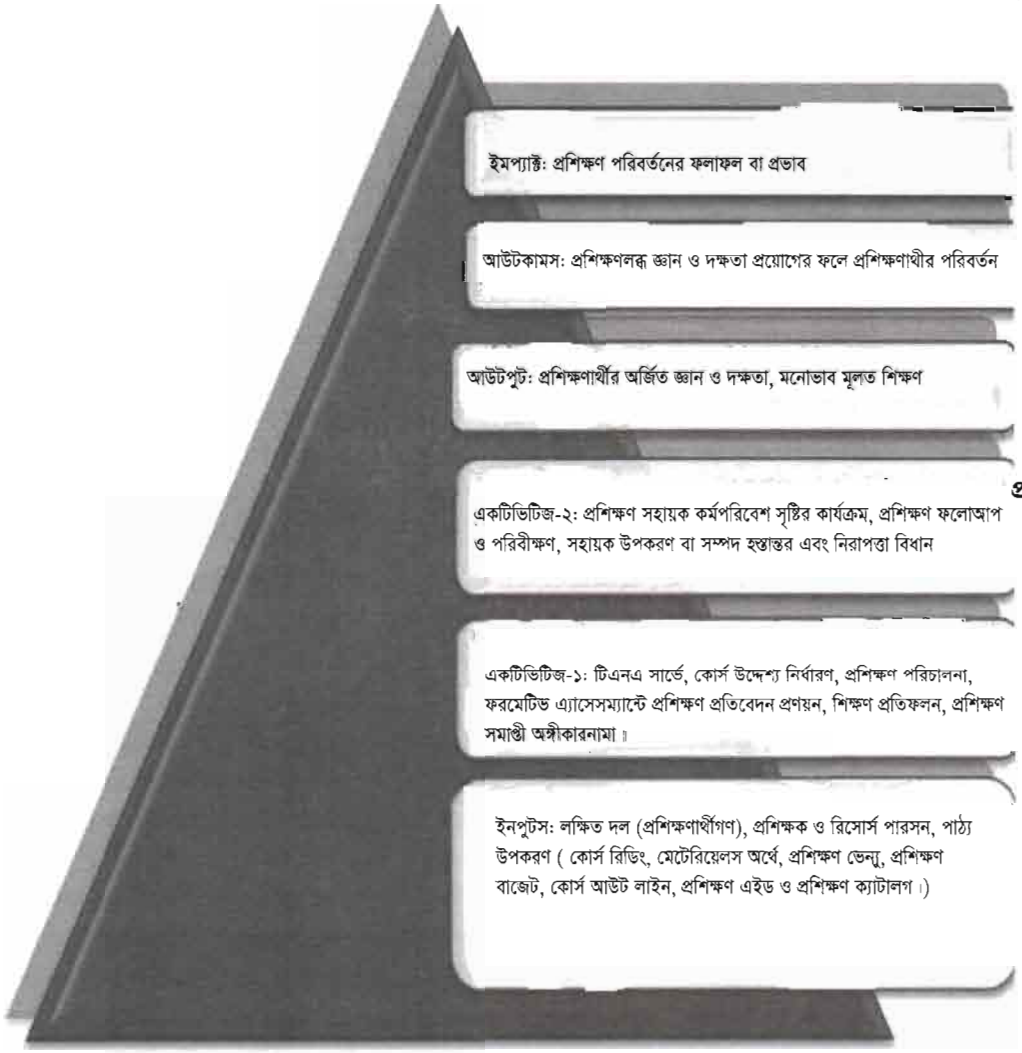

প্রকল্পভিত্তিক আরবিটি চেইন উন্নয়নের সময় ইনপুটস যথাযথভাবে সরবরাহ বা নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা, একটিভিটিজ ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করা হয়েছে কিনা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রত্যাশিত সহযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা সেগুলো বিষয়ের কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে প্রশিক্ষণ আউটকামস, আউটপুটস ও ইমপ্যাক্ট । প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র বা পর্যবেক্ষণের পূর্বে লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, প্রত্যাশা অর্জিত নিদের্শক বা আরবিটি নির্ধারণ (নির্দেশক লেভেল অনুযায়ী) করে নিতে হবে; যাতে লগ ফ্রেমে উল্লেখিত নির্দেশকে প্রশিক্ষণ অবদান রাখতে পারে।

উপসংহার :

রেজাল্ট বেইস্‌ড ট্রেনিং বা আরবিটি পদ্ধতি প্রশিক্ষণ ফলাফল সুনিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা হতে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিটি পর্যায়কে সমান গুরুত্ব প্রদান করে। ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়ক পরিবেশের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকে। প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা আনয়নে আরবিটি এ্যাপ্রোচ গুরুত্বপূর্ণভাবে পালন করবে তা নিশ্চিন্তে বলা যায়।

প্রফেসর ড. গোলাম সামদানী ফকির
উপাচার্য
গ্রিন ইউনির্ভাসিটি অব বাংলাদেশ

ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া
প্রশিক্ষণ ও প্রতিবন্ধিতা বিশেষজ্ঞ
উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী (উজ্জীবিত)
পিকেএসএফ

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ

তরুণ-তরুণীদের বিপথগামিতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা

শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। মানসম্মত শিক্ষাই একটি জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। শিক্ষাই পারে দেশের মানুষকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করে তুলতে। শিক্ষা ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান চর্চাসহ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

এবং পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমেই বর্তমান প্রজন্ম দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেকে তৈরি করতে পারে। সে কারণে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, সৃজনশীল, মানবিক ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

একটি সমাজ ও দেশের জন্য যেমন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী প্রয়োজন, তেমনি একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। আমাদের রয়েছে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদরূপে তৈরি করা হবে।

একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা হবে। আদিকাল থেকে আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বাঙালি সমাজ, দর্শন ও আদর্শের পরিপন্থী। ইসলামও জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না। হজরত মোহাম্মদ(স.) তার বিদায় হজের ভাষণে মানব জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসুলমানের ভাই, আল্লাহর চোখে সবাই সমান'। আজকে ধর্মের নামে বিপথগামী মানুষ যা করছে তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ধারণার ফল। তাদের মধ্যে আছে কিছু ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রতি অন্ধবিশ্বাস আর আস্থা। আমাদের তরুণ-তরুণীরা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে, নিজ ধর্মের মানুষকেও হত্যা করছে। বাংলাদেশে গত ১৮ মাসে ২টি জঙ্গী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রায় ৬২টি কাপুরুষোচিত বর্বর সন্ত্রাসী হামলায় ৭৮জন নিহত হয়েছে।

আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তরুণ-তরুণীদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। আমাদের দেশের ছেলেরা ক্রিকেট এবং মেয়েরা ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলায় বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ

রানা প্লাজার মতো বিভিন্ন মানবিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং বিপথগামীদের সংখ্যাও নগণ্য। জঙ্গি হামলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নেপথ্যে কারা ভূমিকা রাখছে তার কারণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী হওয়ার পিছনেও রয়েছে অনেক কারণ। বিশিষ্টজনদের মতে পরিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, ধর্ম বিশ্বাসের অপব্যবহার ও অপসংস্কৃতি এর মূল কারণ। এছাড়া পিতা-মাতার উদাসীনতা ও অবহেলা সন্তানদের বিপথে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবেও সমাজবিজ্ঞানীগণ চিহ্নিত করেছেন। আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে শিক্ষার্থীরা নানারকম অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে, হয়ে পড়ছে বিপথগামী। তরুণ-তরুণীদের বিপথগামিতার জন্য শুধুমাত্র তারা দায়ী নয়। এর দায় বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও রয়েছে।

আমাদের সমাজের প্রতিটি সন্তান আগামী দিনের অপার সম্ভাবনাময় একজন নাগরিক। শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রথম সোপান হলো পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে আলোকিত ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের। কিন্তু আমাদের পরিবার ও বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ তথা ফলাফলের উপর। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনে ছেলে-মেয়ের প্রতি আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সবাই ভুলে গেছি।

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিটি ধর্মই মানবাধিকার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যবোধ ও সহমর্মিতার শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন- 'যার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে, সে পরের ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না'। তাহলে তরুণ শিক্ষার্থীরা কেন বিপথগামী হচ্ছে, কেনইবা তারা মানুষ হত্যা করছে। ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা ও উদ্ভূত উন্মাদনার কারণে তারা বিপথগামী হয়ে উঠেছে। কাজেই পরিবার ও বিদ্যালয়ে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদানে অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ ও মূল্যবোধ গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিচালিত অন্যান্য কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ব্যক্তিগত মেধা প্রদর্শনের সঙ্গে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ, সুশৃঙ্খল আচরণ, সহমর্মিতা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠে। আমাদের দেশে বিদ্যালয় ও পরিবারে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ নেই, নেই তেমন সুযোগও। গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত ২০১৫ সালে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীত। ৪৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় না বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শিক্ষকগণ কী ভূমিকা রাখছেন? সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া ও শিক্ষার্থী সমাবেশে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি প্রজ্ঞাপনও জারী করেছে।

এছাড়া গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'তারুণ্যই রুখবে জঙ্গিবাদ, চাই সম্মিলিত প্রয়াস' শ্লোগানকে সামনে রেখে সচেতনতামূলক সমাবেশও করেছে। সম্প্রতি পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের সমাবেশ, র‍্যালি, বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস পালন এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক উন্নয়ন ও মূল্যবোধ বিকাশের পাশাপাশি তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে। শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার উপর্যুক্ত পরিবেশ তৈরি ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও ইতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি করে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টিকল্পে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা ও উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা তদারকি করাও প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভেঙে পড়ছে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন। প্রায় প্রতিটি পরিবারে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। পরিবারে ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মার স্নেহ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । তারা তাদের মনের অভিপ্রায় ও সমস্যাগুলো বাবা-মার সঙ্গে বিনিময় করতে পারছে না, যা কীনা শিশুকাল থেকে তাদের বেড়ে উঠায় ও মূল্যবোধ চর্চায় ভূমিকা রাখতে

পারে। এছাড়া বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের অনৈতিক কার্যকলাপ, পারিবারিক নির্যাতন ও বৈষম্য, অপসংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে অভিভাবকদের অক্ষমতাও শিক্ষার্থীদের বিপথগামী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ও অনৈতিক ব্যবহারও তরুণদের বিপথে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি পরিবারে শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, আদর্শ পরিবেশ গঠনের উপর জোর দিতে হবে।

তরুণরাই আমাদের সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমান তরুণ-তরুণীদের বিপথগামী হওয়া ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার পিছনে হতাশা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে না পারাও একটি বড় কারণ। শিক্ষাকে কর্মমুখী ও জীবনমুখী করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সারা বিশ্বব্যাপী গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও সমাজ ও মানুষের শান্তি, ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, আইনের প্রয়োগসহ জনসচেতনতায় নিয়েছে নানা পদক্ষেপ। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে তরুণ সমাজ ও সচেতন হয়েছে সাধারণ মানুষ। নেলসন ম্যান্ডেলা যথার্থই বলেছেন- Education is the most powerful weapon which you can use to change the world- কাজেই ছেলে-মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে তারাই রুখবে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে। ধ্বংস নয়, সৃষ্টিশীল কাজে তরুণদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে। তরুণ-তরুণীদের বিশেষ করে আগামী প্রজন্মকে বিপথগামিতা ও জঙ্গিবাদ থেকে ফিরিয়ে আনা ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১. বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত চর্চা নিয়মিতকরণ;

২. শিক্ষার্থী সমাবেশ আয়োজন করা, সমাবেশে প্রতিদিন একটি করে নীতিবাক্য বা মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা;

৩. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানো;

৪. বিভিন্ন দিবস পালন করা, যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ, নেতৃত্বের দক্ষতা, সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটবে;

৫. বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ছবি আঁকা, বিষয়ভিত্তিক বির্তক ও বই পড়ার প্রতিযোগিতা, রচনা লেখা, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি আয়োজন করা।

৬. বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নিয়মিত বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন নিশ্চিত করা;

৭. নিয়মিত অভিভাবক সভা করে সেখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা/করণীয় বিষয় তুলে ধরা;

৮. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করা;

৯. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টিকল্পে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ তৈরি;

১০. পরিবারে বাবা-মাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা ও তাদের সময় দেওয়া। শিক্ষার্থীদের মতামত জেনে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা;

১১. শিক্ষক ও অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা। তাদের সামনে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন ও আদর্শ ব্যক্তিদের সফল কাহিনী তুলে ধরা।

একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিকারহীনতা, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, সুষ্ঠু সংস্কৃতির চর্চা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও প্রয়োজন। সভ্যতা কখনও পিছনের দিকে যাবে না, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সভ্যতা সামনের দিকে অগ্রসর হবে। বিপথগামী তরুণ-তরুণীদের ফিরিয়ে আনা ও আমাদের সন্তানদের বেড়ে উঠায় সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশ তৈরিতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মতো অপশক্তিকে রুখতে সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই আমাদের জাতীয় জীবনে এই অন্ধকার সময়ের চির অবসান ঘটবে। সম্ভাবনাময় নতুন প্রজন্মকে সুনাগরিক ও আলোকিত মানুষ হিবেবে গড়ে তুলতে পারব।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ
উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান

মোঃ মিজানুর রহমান

উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী

ভূমিকা

নিজের বেড়ে উঠার কথা ভাবুন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন টেলিফোন বা দূরালাপনীর সাথে, পরিচিত হয়েছেন রেডিও-এর সাথে, পরিচিত হয়েছেন টেলিভিশনের সাথে, পরিচিত হয়েছেন কম্পিউটারের সাথে, আর মোবাইল তো এখন আপনার নিত্য সঙ্গি।

১৮৭৬ সালে গ্রাহাম বেল সাহেবের আবিষ্কৃত টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনে দিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তারের মাধ্যমে এ যন্ত্রটি দূর-দূরান্তে যোগাযোগ করতে পারে বিধায় এর নাম দেওয়া হয় দূরালাপনী। গ্রাহাম বেলের তারযুক্ত যন্ত্রের পর মার্কনি হাজির হলেন তারবিহীন যন্ত্র অর্থাৎ বেতার বা রেডিও নিয়ে। এই শ্রবণ যন্ত্রটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে যোগ করল এক নতুন মাত্রা। এরপর সিনেমা যা শ্রবণের সাথে যোগ করল দর্শন। পরে ফ্লেমিং হাজির হলেন তারবিহীন শ্রবণ-দর্শন যন্ত্র অর্থাৎ টেলিভিশন নিয়ে। টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন যার কথাই বলি না কেন সবই যোগাযোগ প্রযুক্তি। এগুলোর মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল এদের ব্যবহার একটি সীমানায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি থেমে নেই। গ্রাহাম বেলের তারযুক্ত যন্ত্র টেলিফোনটিও তারবিহীন হয়ে গেল। অর্থাৎ সভাতায় যুক্ত হল মোবাইল ফোনের ব্যবহার।

পরিশেষে আবিষ্কৃত হল উপাত্ত (data)-কে তথ্য (information)-এ পরিণত করতে অধিক শক্তিশালী যন্ত্র – কম্পিউটার। আর এই যন্ত্রটি 'যোগাযোগ প্রযুক্তি' – ফোন, রেডিও, এবং টেলিভিশন – 'তথ্যপ্রযুক্তি'র সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে মানব সভ্যতার জন্য নিয়ে আসল এক অনন্য উপহার। সবশেষে ইন্টারনেট-প্রযুক্তি অর্থাৎ ওয়েব-প্রযুক্তি দৃশ্যপট আরো বদলে দিল। পরিবর্তন হল নাম –তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information & Communication Technology); সংক্ষেপে আইসিটি (ICT)। আইসিটি দন্ত চিকিৎসকের দাঁত খুলে ফেলার মতো গ্রাহাম বেলের টেলিফোনের তার খুলে ফেলেছে। আর ওয়েব-২ (বিন-২) প্রযুক্তির মাধ্যমে উপহার দিয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক ফোন যোগাযোগ–যা বর্তমানের ভাইবার (Viber), স্কাইপি (Skype), হুয়াট্সআপ (What's Up) এবং ম্যাসেঞ্জার (Messenger) ইত্যাদি নামে পরিচিত।

আইসিটি - রেডিও/টিভি নামক বাক্সটিকে প্রায় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রবর্তন করেছে webRadio, webTV| আইসিটির এ সকল সুবিধা শিক্ষাক্ষেত্রে টনিকের মতো কাজ করছে। তাই প্রবর্তন হয়েছে ই-লার্নিং, ই-বুক এবং ই-কনটেন্ট ইত্যাদি। আর এতো কিছুর কারণে উন্নত বিশ্বে শ্রেণীকক্ষ পাঠদান পড়েছে হুমকির মুখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইউরোপের Future Education Project-এর অনুমান। কারণ তাদের অনুমান হল ভবিষ্যতে শ্রেণিকক্ষ বলে কিছু থাকবে না। শিক্ষকগণ হয়ে যাবে ভার্চুয়াল শিক্ষক। যা হোক অনেক কথা বলা হল। বক্তব্যের বিষয় ছিল– উন্মুক্ত শিখনসামগ্রী। এবার সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী

তথ্য-প্রযুক্তির যুগে শিখন সামগ্রীর মুদ্রিত উপকরণ যেমন– পুস্তক, পত্রিকা, সাময়িকী, গবেষণা-প্রবন্ধ; শ্রবণ-দর্শন উপকরণ যেমন – অডিও লেকচার, ভিডিও লেকচার সবই ওয়েব প্রযুক্তির মাধ্যমে সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে YouTube-এর মাধ্যমে এর পর্যাপ্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিখনসামগ্রী ওয়েবের মাধ্যমে সার্বজনীন করার কাজ পুরাদমে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বময়। শিখনসামগ্রী অবশ্যই মেধাভিত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) যা গ্রন্থস্বত্ব আইন (Copyright Act) দ্বারা প্রতকারকের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। তাই শিখনসামগ্রী ওয়েবের মাধ্যমে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে গ্রন্থস্বত্বের প্রশ্নটি থেকেই যায়। আর এ বিষয়টি মাথায় রেখে ওয়েবের মাধ্যমে উপকরণগুলো বিনামূল্যে ব্যবহার, পুনঃব্যবহার এবং পুনরায় প্রণয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রচলন করা হয়েছে 'উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী' অর্থাৎ Open Educational Resources (OER)। এটি ওয়েবসাইটে শিখনসামগ্রীর মঞ্চ (platform) মাত্র। এই প্রবন্ধে ও.ই.আর.-এর খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পারবেন।

ও.ই.আর. হল একটি ওয়েবসাইটের শিখন-মঞ্চ–যেখানে পাঠ-পরিকল্পনা, পুস্তক এবং অন্যান্য শ্রবণ-দর্শন উপকরণ রাখা হয়।

এই ওয়েবসাইট হতে পারে পাবলিক ডোমেইন, আবার হতে পারে কোনো লাইসেন্সভিত্তিক ডোমেইন। এই প্লাটফরমের উপকরণগুলো ব্যবহারকারী বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারে বিধায় এগুলো মুক্ত শিখনসামগ্রী হিসেবে পরিচিত। ও.ই.আর. শুধু শিখন উপকরণগুলো বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগই দেয় না –এটি প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী করার সুযোগও দিয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – ও.ই.আর. মঞ্চে বিদ্যমান একটি ভূগোলের বইয়ের মধ্যে আপনার শিক্ষার্থীর জন্য নিজস্ব ভৌগোলিক পটভূমি এবং প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারেন। আবার ধরুন, একটি সুন্দর গল্পের বই আপনার শিক্ষার্থীর জন্য অনুবাদ করিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং ও.ই.আর. বিনামূল্যে ব্যবহারের সাথে শিখন সামগ্রীগুলো নিজের জন্য খাপ-খাওয়ানোর সুযোগ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় আপনি আপনার নিজের কোনো একাডেমিক কাজ এবং এর পরিমার্জন এই ও.ই.আর. প্লাটফর্মে করতে পারেন।

আপনার শিক্ষার্থীরা তা অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষাথীদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে বহু ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– ধরুন, আপনি ভারতের একটি বিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে নিজের কিছু পাঠ এবং উদাহরণ যোগ করে দিলেন। পরে বইটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হল। এভাবে আপনার কাজটির ব্যবহার প্রসারিত হল– আর বিশ্ব হল ছোট।

ও.ই.আর. মঞ্চ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে ও.ই.আর মঞ্চ তৈরি করা যায়। বর্তমানে যতগুলো প্রতিষ্ঠান (actor) রয়েছে এর মধ্যে Creative Commons (CC) অন্যতম জনপ্রিয় এবং ব্যবহার-বান্ধব। সিসি শুধু শিখনসামগ্রী, বিনামূল্যে ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহারের অনুমতিই দেয় না–এটি অবাণিজ্যিকও বটে। এটি বহুল ব্যবহৃত। নিচে কয়েকটি ও.ই.আর. প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল:

- OER Commons : তথ্য অনুসন্ধান এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান রূপান্তরের অনন্য ওয়েব মঞ্চ।
- Curriki : এই প্লাটফর্মে পাঠক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের অনুসন্ধান করা যায়।
- Gooru : এই প্লাটফরর্মে প্লেলিস্ট প্রণয়ন করা যায় এবং তা পরিমার্জনও করা যায়। আবার কিছু অন-লাইন শিখনসামগ্রী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে বিনিময় করার সুবিধাও রয়েছে এই মঞ্চে।
- Open Culture : এই মঞ্চে কিছু তালিকাভুক্ত প্রবন্ধ অনুসন্ধানের সুযোগ থাকে যার বেশির ভাগই ও.ই.আর.– যেমন, কিণ্ডেল এবং অহিপাড়ের ৭০০ বই।
- CC : এটি অনেকগুলো ওয়েবসাইটের একটি ডিরেক্টরি যা মুদ্রিত ও শ্রবণ-দর্শন উপকরণ বিনামূল্যে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে।

সাহিত্যের ও.ই.আর. মঞ্চ

ও.ই.আর.-এর কারণে পুরনো দিনের সাহিত্য মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলি; 'গোথেনবার্গ প্রকল্প' ১৯২৩ সালের পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকের পুনঃপ্রকাশ করেছে ওইআর মঞ্চের মাধ্যমে। এছাড়া ফেইসবুকের মাধ্যমে আমরা আরো অনেক প্রকাশকের পাবলিক ডোমেইন পেয়ে থাকি।

আমরা খুব সহজেই ওয়েবসাইটে সার্চ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুদের জন্য নানা ধরনের গল্পের বই, কমিক এবং চিত্র সংগ্রহ করতে পারি। এ সম্পর্কিত কয়েকটি ও.ই.আর. প্লাটফর্মের নাম দেওয়া হল :

- UNESCO's Women in African History-আফ্রিকা মহাদেশের মহিলাদের নিয়ে লেখা জীবনীপ্রবন্ধ, কমিক, ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি বই এই প্লাটফর্মে প্রকাশ করা হয়েছে।
- Mustard Seed Books- বিজ্ঞান ও প্রকৃতির ওপর প্রাথমিক পাঠকদের জন্য লেখা বই এই প্লাটফর্মে প্রকাশ করা যায়।
- Bookdash- নানা ধরনের কমিউনিটির ওপর লেখা বই এই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- Prothan Books from India- এখানে শিশুদের জন্য প্রায় ১০০ বই রয়েছে;
- African story book project -এই প্লাটফর্মটিও শিশুদের জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লোকগাথার নানা বই প্রকাশ করেছে;

গণিত/বিজ্ঞানের ও.ই.আর.

Ck-12- গণিত ও বিজ্ঞানের ওপর নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে যা শিক্ষকগণ নিজেদের উপযোগী করে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করছে।

Sivavula- এই প্লাটফর্মটি গণিত ও বিজ্ঞানের ওপর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বই প্রকাশ করছে – সেই সাথে শিক্ষকদের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল;

Geofebra - k-12 -এটি গণিত শেখার জন্য সফটওয়ারের একটি উৎস;

ভিডিও ও কোর্সভিত্তিক ও.ই.আর.

Khan Academy - বিভিন্ন কোর্সের ওপর ভিডিও বিনামূল্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর অনেকগুলো ঈঈ লাইসেন্সিং-এর আওতাভুক্ত যা ডাউনলোড করে নিজের মতো করে ব্যবহার করা যায়।

MIT's Open Courseware Consatium (MOOC)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিনামূল্যে কোর্স ও পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়;

Mountain Heights Academy-

এটি মূলত Ufah স্টেট অঞ্চলের জন্য অনলাইন চাটার্ড স্কুল। তবে তাদের শিখন সামগ্রীর পুরোটাই বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়।

HippoCampus - National Repository of Online Courses (NROC)

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রায় ৫,০০০ মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষামূলক ভিডিও এই প্লাটফর্মে রয়েছে;

উপসংহার

কীভাবে ও.ই.আর.-কে ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার করা যায়? ও.ই.আর.-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লিখিত সামগ্রী সহজেই ব্যবহারের জন্য পরিমার্জন করা যায়। কিন্তু ছবি ও ভিডিও খুব সহজে পরিমার্জন করা যায় না। কিছু ওয়েব সাইট যেমন, ক-১২ তাদের পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের সুযোগ দেয়। যেমন- Protham Books - মূল ছবি ও ফাইলের সাথে Dropbox ফোল্ডারে ডাউনলোডের সুযোগ দেয়।

২০০২ সালে উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী (OER) বিষয়টি সর্বপ্রথম UNESCO প্রবর্তন করে। উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী (OER)-কে UNESCO নিম্নোক্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করে :

...teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an intellectual property license that allows for free use, adaptation, and distribution ([UNESCO, 2002].

তবে, UNESCO উপরোক্ত সংজ্ঞায় যে ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তা Hylen, et al (২০১২) সালে UNESCO-সহ সংশ্লিষ্টদের নজরে আনেন। এর ফলে UNESCO ২০১২ সালে উন্মুক্ত শিখনসামগ্রী (OER)-কে পুনরায় নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে :

...OERs are teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an open license that allows for free use, adaptation, and distribution [UNESCO, 2012].

একই বছর The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) উন্মুক্ত শিখন সামগ্রী (OER)-কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে :

.....digitized materials offered freely and openly for educators, students, and self-learners to use and reuse for teaching, learning, and research. OER includes learning content, software tools to develop, use, and distribute content, and implementation resources such as open licenses (OECD, 2012).

উপর্যুক্ত বিভিন্ন আন্তজার্তিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উন্মুক্ত শিখন সামগ্রীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমুহ পাওয়া যায়–

- বিনামূল্যে শিখনসামগ্রী ব্যবহার করা যায়;
- উন্মুক্ত (বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়, পাবলিক ডোমেইন লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে রাখা হয়);
- একে অপরের সাথে বিনিময় করা যায় এবং পুনরায় বিতরণের সুযোগ থাকে;
- শিক্ষকগণ সেগুলোর ব্যবহার, পুনঃব্যবহার এবং সংযোজন করে শিক্ষার উৎকর্ষ ও গুণগত মান বাড়াতে পারে;
- ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

মোঃ মিজানুর রহমান
শিক্ষক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মাহমুদ হাসান রাসেল

শিশুবান্ধব শুভসূচনা

একটি পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবারে যারা বয়স্ক থাকেন তারা সারা জীবনে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে শিশুর সাথে খেলতে খেলতে তাকে অনেক কিছু শেখাতে পারেন। কারণ শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। কখনো কখনো আমরা অবাক হয়ে বলি 'ও এই কথাটা কোথা থেকে শিখলো ?' অথচ আমরা ভুলে যাই যে, আমরাই হয়তো এই কথাটি তার সামনেই অন্য কাউকে বলেছিলাম। শিশুটি তা শুনেই শিখেছে।

পরিবারের এই শিশুটি যদি মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে সেটাই হবে একটি পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় মানবিক সঞ্চয়। মানবিক সম্পদকে যত্নে লালন করতে হয়। একটি গাছের চারা রোপণ করে সেটিকে যত্ন না করলে সে কি ঠিকভাবে বেড়ে উঠবে? যথাযথ পরিচর্যার অভাবে বেড়ে উঠলেও সে ঠিকভাবে ফুল বা ফল দেবে না। তেমনি মানব শিশুকেও সহজ ও সুন্দর পরিবেশ দিতে হবে। সে যখন আগ্রহ ভরে আপনার কাছে আসবে, কিছু একটা জানতে চাইবে, বা কোন কিছু পড়ে শোনাতে বলবে, সঙ্গ কামনা করবে, তাকে ঠিক তখনই সময় দিতে হবে। যদি তখন তা না করেন পরে যখন আপনার ইচ্ছা কিংবা অবসর অনুযায়ী আপনি তাকে শেখাতে চাইবেন ততক্ষণে হয়ত তার মনোযোগ অন্য কোন কিছুতে কেন্দ্রীভূত হবে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন কোন শিশু সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ মিনিট আপনার সাথে থেকে জানতে বা শিখতে চাইবে। তারপরই সে চলে যাবে অন্য কিছু করতে। আর অধিকাংশ সময় এই আগ্রহের জায়গাটা বেশিরভাগ শিশুরই থাকে তিন থেকে চার মিনিট। আমরা বড়রা একটু ধৈর্য্য ধরে সেই সময়টুকু অর্থাৎ ৩ থেকে ৪ মিনিট, সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ মিনিট এই সময়টুকু শিশুকে দিয়ে শিশুর বন্ধু হতে পারি অনায়াসেই। আরেকটি কথা, হয়তো আপনি টিভি দেখছেন আর সেই একই সময়ে শিশুটিকে ধমক দিয়ে পড়তে পাঠাচ্ছেন, তাহলে শিশুটি পড়ায় মনোযোগী হবে না। আবার শিশুটি আপনাকে হয়ত কখোনো বই নিয়ে বসতে দেখে না। তাই ওর শিশু মনে ধারণা জন্মাতেই পারে মা-বাবাকেতো পড়তেই দেখি না কখোনো, আমি তাহলে পড়ব কেন? তাই শিশু যখন পড়তে বসে তখন আপনিও তার পাশে বসেই আপনার পছন্দমতো কোন বই পড়ুন। পত্রিকা পড়ার সময় শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বসুন। শিশুর উপযোগী কোন বিষয়ের প্রতি তাকে আগ্রহী করে তুলতে চাইলে তাকে পড়ে শোনান। বিভিন্ন সময় তাকে পড়ে শোনালে এক সময় তার নিজেরই পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে। গল্প করতে করতে শোনাতে পারেন বিখ্যাতদের জীবনী অথবা জীবন ঘনিষ্ঠ কোন ঘটনা। ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে শিশুকে সাংসারিক কাজে আগ্রহী করে তুলুন। তবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ভুল করার অধিকার দিতে হবে। সামান্য কিছু নষ্ট করলেই তাকে বকা দিয়ে তার বৃহত্তর সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যাবে না। আজকাল অনেক শিশুই ভাগ করে নেয়া বা ভাগাভাগি করে খাওয়া বিষয়টি মানতেই চায় না। একটি চকলেট আপনার শিশুটির জন্য আনুন আর একটি বাড়ির কাজের সাহায্যকারী ছেলে বা মেয়েটির জন্য আনেন তবে সে সমতা শিখবে।

আমরা জানি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুতের প্রথম পদক্ষেপ ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে রাজপথের মিছিলের অগ্রভাগে এগিয়ে এসেছিলো সুবিধাবঞ্চিত বেশকিছু ক্ষুদিরাম। যারা আমাদের কাছে পরিচিত পথশিশু অথবা টোকাই নামে। পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সেইদিনের সেই মিছিলের সামনে পথশিশুর মুষ্ঠিবদ্ধ প্রসারিত হাত এবং প্রতিবাদের ছবি প্রয়াত সাংবাদিক রশীদ তালুকদার এর ক্যামেরায় ধারণ হয়ে সেই সময়ের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিলো। সেদিনের সেই গণঅভ্যুত্থানের মিছিলের অগ্রভাগে থাকা প্রতিবাদী পথশিশুদের ঐ মিছিলেই শাসকশ্রেণীর বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিলো। সেসব প্রতিবাদী ক্ষুদিরামদের জন্য লেখার শুরুতেই রইলো সম্মান ও শ্রদ্ধা। সেই সাথে স্মরণ করছি সেমিওনভিচ মাকারেঙ্কোকে যিনি ১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাজার হাজার পথভ্রষ্ট পথশিশুদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন গোর্কি উপনিবেশ। স্মরণ করছি মাদার তেরেসাকে যিনি ১৯৪৮ এর ১৬ই আগষ্ট নিরাপদ, নিশ্চিত জীবন ও শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পথশিশু এবং রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ক্ষুধার্ত, অসুস্থ অসহায় মানুষের সেবায় নেমে আসেন কলকাতার পথে। সেই সাথে ডা: হারমান গ্যামিনরকেও। তিনি ১৯৪৯ সালে বাংলাদেশী মুদ্রা ৬০০ টাকা সম্বল করে অষ্ট্রিয়ার পথশিশুদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন এস.ও.এস. চিলড্রেন ভিলেজ। যার কার্যক্রম এখন বিস্তৃত সমগ্র পৃথিবীতে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র শিশুদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। যদিও সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী শিশুদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টিতে জোর দেয়া হয়েছে। ইউনিসেফের পক্ষ থেকে বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১৬ (এ ফেয়ার চান্স ফর এভরি চাইল্ড) শীর্ষক একটি প্রতিবেদন বের হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অগ্রগতির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যার প্রমাণ মিলেছে এবারের বাজেটে। মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এটা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুদের কল্যাণে কাজ করবে। এর ৮০ শতাংশ শিক্ষা, ৯ শতাংশ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বরাদ্দ। সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ ৪ শতাংশ।

বর্তমান ধারায় অসাম্য চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে ৬ কোটি ৯০ লাখ শিশুর মৃত্যু ঘটবে বলে সতর্ক করেছে ইউনিসেফ। জাতিসংঘের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা বলা হয়। আরো বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬ কোটি ৭০ লাখ শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করবে। এ সময়ে বাল্যবিয়ের শিকার হবে ৭৫ কোটি মেয়ে। বাংলাদেশের শিশুরা এর বাইরে নয়।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্থনি লেইক এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, কোটি কোটি শিশুর জীবনে একটি ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া শুধু তাদের ভবিষ্যতকেই হুমকিতে ফেলে না, বংশ পরম্পরায় প্রতিকূলতার চক্র তৈরির মাধ্যমে তা তাদের সমাজের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে। তাই শিশুকে আদর্শায়িত করে গড়ে তুলতে হলে তার সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, পছন্দনীয় বিষয় এর পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে রাখা উচিৎ; যাতে করে শিশুর শারীরিক, জ্ঞানগত ও আবেগিক বিষয়গুলো যথাযথভাবে কাজে লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিষয়গুলো হলো:

● কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ; ● ধৈর্য্য ও দায়িত্ববোধ; ● নীতিবোধ; ● যুক্তি নির্ভরতা; ● নিজের প্রতি আস্থা; ● সৃষ্টিশীল মনোবৃত্তি; ● অভিভাবক ও শিক্ষকের প্রতি মনোভাব; ● বিদ্যালয়ের প্রতি মনোভাব; ● বিষয়ভিত্তিক পছন্দনীয় শিক্ষক; ● রুচি ও পাঠে আগ্রহ; ● পছন্দনীয় বিষয়; ● কঠিন বিষয়; ● সহপাঠীদের প্রতি মনোভাব; ● বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার; ● শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা; ● সহপাঠীদের সাথে আচরণ; ● বিষয়ের প্রতি ঝোঁক; ● সাংস্কৃতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ; এবং ● শ্রেণীতে নেতৃত্বদান।

একটি শিশুর শারীরিক বিকাশ সাধারনত তার পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের মত দরিদ্র দেশে ৮০% মা পুষ্টি হীনতায় ভোগে। সুতরাং তাদের সন্তানরাও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে তাদের শারীরিক বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।

পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোকে সাধারনত শিশুর মানসিক বিকাশ বলে। শিশু জন্মাবার পর কান্না, হাসি এবং হাত-পা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। জন্মের পরপরই সে পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। তবে ধীরে ধীরে তার মস্তিস্কের স্নায়ুকোষের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিস্তৃতির ফলে তার মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বোধশক্তির বিকাশ ঘটায় প্রথম তার একান্ত নিজস্ব বা কাছের পরিবেশকে চিনতে শেখে।

একটি ছয় মাসের শিশু বাড়িতে কোন অতিথি এলে তাদের কোলে যেতে চায় না। একটি তিন বছরের শিশু বাড়িতে কেউ এলে তার প্রিয় খেলনাটি লুকিয়ে রাখে। একটি ছয় বছরের শিশু খেলার জন্য বন্ধু পছন্দ করে। দরিদ্র পরিবারের একটি নয় বছর বয়সের ছেলে শিশু জানে যে কোথা থেকে জ্বালানী ও

গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। একটি সাত বছরের মেয়ে শিশু তার তিন বছর বয়সী ভাইয়ের খাবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখে এবং তার সাথে খেলাধুলা করে। একটি এগার বছরের মেয়ে শিশু তার মাতা-পিতা যখন মাঠে কাজ করে তখন পরিবারের জন্য খাবার রান্না করে। একটি বার বছরের ছেলে শিশু বাজারে গিয়ে সস্তায় পণ্য ক্রয়ের জন্য দরকষাকষি করে। তের বছর বয়সের রাস্তায় বসবাসরত শিশু জানে যে সে রাতে কোথায় ঘুমাবে এবং তার সঞ্চিত টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখবে। এই সব আচরণ শিশুর পর্যায়ক্রমিক বড় হয়ে ওঠার এক একটি ধাপ।

ভাষা হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের একটি শক্তিশালী বাহন। কান্নার মাধ্যমে শিশু প্রথম তার কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করে। ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য শিশুকে কতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম অবস্থায় শিশু কান্নার মাধমেই অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তার চাহিদা ও দাবী জানায়। পরের স্তরে কান্না একটি বিশেষ রূপ নেয়। এ পর্যায়ে সে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে, নাকি ব্যথা পেয়ে কাঁদছে তা অনুমান করা যায়- কান্নার ধরন দেখে।

পাঠকগণ একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, সকল অধিকার সকল শিশুর ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়া সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকল শিশু সকল অধিকার সমভাবে ভোগের অধিকারী। শিশুদেরকে যে কোন প্রকার বৈষম্য থেকে সুরক্ষা এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়ন ও এগিয়ে নেয়ার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, সামর্থ, জন্মসূত্রে কিংবা অন্য কোন বংশগত অবস্থানের কারণে বৈষম্য করা যাবে না।

আমরা দেখেছি, সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু, ধনী পরিবারের শিশু ও গরীব পরিবারের শিশু, উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণ, সুস্থ্য শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশু, স্কুলে যাওয়া শিশু ও স্কুলে না যাওয়া শিশু, মেধাবী শিশু ও কম মেধাসম্পন্ন শিশু, সরকারী স্কুল ও বেসরকারী স্কুল, নিজ শিশু ও দত্তক শিশু, শহরের শিশু ও গ্রামের শিশু ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু এইসব বিষয়ে বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়।

একটি সম্মানজনক রাষ্ট্র গঠনে সকল স্তরের জনগণ এবং রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য যা যা করণীয়:

- শিশু সংক্রান্ত যে কোন কর্মকান্ডে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে সবার আগে বিবেচনায় আনতে হবে এবং প্রাধান্য দিতে হবে;
- প্রতিটি শিশুর রয়েছে বেঁচে থাকা ও উন্নয়নের অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- শিশুদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ, চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, তথ্য জানা, সংগঠনে যোগদান ও গঠন এবং শিশুদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার নিশ্চিত করা;
- কোনভাবেই শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োজিত করা যাবে না;
- যে কোন কর্মকান্ডে শিশুদেরকে নির্ভরশীল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা;
- শিশুদের কথা শোনা- বলা- জিজ্ঞেস করা;
- বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো;
- অন্য কাউকে ভাল আচরণ শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের শিখতে সহায়তা করা;
- খেলাধুলা, চাষাবাদ, বাগান করা প্রভৃতি কাজে উৎসাহ দেয়া;
- শিশুদের জীবন অথবা তাদের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে তাদের সম্পৃক্তকরণ;
- গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশুর ২ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে ১০০০দিন হিসেব করে শিশুর অপুষ্টি রোধে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ১০০০দিনের কর্মসূচির ধারনা প্রতেকেরই থাকতে হবে।

একটি শিশুকে শুধু একটি পরিবারের সন্তান হিসেবে গণ্য না করে তাকে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চালক হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবেই আমরা পাবো সময়ের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী উন্নত বাংলাদেশ।

মাহমুদ হাসান রাসেল

উন্নয়ন গবেষক এবং
জাতীয় সমন্বয়কারী, গণশিক্ষা আন্দোলন ফোরাম

কন্যাশিশুর অগ্রগতির জন্য চাই পর্যাপ্ত তথ্য

বিশ্বে বর্তমানে ১১০ কোটি (১ দশমিক ১ বিলিয়ন) কন্যাশিশু রয়েছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। কিন্তু কন্যাশিশুরা এখনো অহরহ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং তারা ছেলেদের মতো সব সুযোগ পায় না। এ কারণে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি অপুষ্টির শিকার হয়। স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। বাল্যবিবাহে বাধ্য হয়। শিকার হয় নির্যাতন ও পাচারের। এসবই শিশু অধিকার-সংক্রান্ত কনভেনশন এবং অধিকাংশ দেশের সংবিধানের লঙ্ঘন। কন্যাশিশুরা যেসব বৈষম্যের শিকার হয়, তা প্রায়ই তথ্য আকারে দলিলবদ্ধ করা হয় না। অথচ তাদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য হাতে থাকলে তা কন্যাশিশুর সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত। বৈশ্বিকভাবেই কন্যাশিশু-সম্পর্কিত ও লিঙ্গভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এই তথ্য থাকলে তা গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ ও কর্মসূচি নির্ধারণে প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু যথেষ্ট তথ্য না থাকায় এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তথ্য থাকলে কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত হতো।

বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের পরিস্থিতি

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ (১৬ মিলিয়ন) কন্যাশিশু আছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। কন্যাশিশুর জীবনের প্রথম ১০ বছরের তথ্য মোটামুটি পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় দশক বা কৈশোরকালের তথ্য খুব কমই মেলে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের তথ্য নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) কাছে আছে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের লিঙ্গভিত্তিক তথ্য। এর মধ্যে আছে স্কুলে ভর্তি, পড়ালেখা চালু রাখা ও ঝরে পড়ার তথ্য। বাংলাদেশ মেটারনাল মর্টালিটি অ্যান্ড হেলথ কেয়ার সার্ভে (বিএমএমএস) ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের তথ্য নিয়ে কাজ করে। লেবার ফোর্স সার্ভে (এলএফএস) কাজ করে ১৫-১৯ বছর বয়সীদের লিঙ্গভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য নিয়ে। এ কথা বলা জরুরি যে এসব জরিপে বিশেষ করে অবিবাহিত কিশোরীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্ব পায়নি। ফলে কোন কোন সামাজিক বিষয় কীভাবে তাদের জীবনকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে, তা বোঝা দুরূহ হয়ে পড়ে।

লক্ষণীয় হলো, জরিপের মাধ্যমে যেসব তথ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের অবস্থা ছেলেদের মতো ভালো নয়। যেমন: ব্যানবেইসের ২০১৪ সালের এক জরিপ বলছে, ৬৮ শতাংশ মেয়ে এবং ৫৭ শতাংশ ছেলে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্কুলপর্যায়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। পড়া শেষ না করে ৪৭ শতাংশ মেয়ে স্কুল ছাড়ে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৫ শতাংশ।

২০১৩ সালের লেবার ফোর্স সার্ভেতে দেখা যায়, শ্রমশক্তিতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৮ লাখ (২ দশমিক ৮ মিলিয়ন) ছেলে এবং ১৯ লাখ (১ দশমিক ৯ মিলিয়ন) মেয়ে কাজ করছে অথবা কাজ খুঁজছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে, এই বয়স- শ্রেণির মেয়েরা কেন ছেলেদের চেয়ে শ্রমশক্তিতে কম অংশ নেয়। তা ছাড়া এই মেয়েরা ঠিক কী ধরনের কাজে যুক্ত, সে সম্পর্কিত তথ্যের অভাব আছে। এই তথ্য থাকলে শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পদক্ষেপে তা ব্যবহার করা যেত। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যেসব তথ্য আছে তাতে দেখা যায়, ওই সব দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অবস্থা বেশ শোচনীয়। বিডিএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার হতাশাজনক। কন্যাশিশুদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য এবং কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ তাদের জন্য জুতসই নীতি, কর্মসূচি ও বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করবে। আর এভাবেই কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব। কিশোরীদের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো:

* কন্যাশিশুদের গুরুত্ব দিয়ে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বিস্তারে জাতীয় সক্ষমতা ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের জীবনের দ্বিতীয় দশকের তথ্য গুরুত্ব পাবে।
* নীতি ও প্রকল্পে জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য ব্যবহার। কিশোরীদের প্রয়োজন মেটাতে সম্পদ বরাদ্দের জন্য প্রচেষ্টা।
* কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার সুরক্ষা। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত যৌনশিক্ষা; যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য ও সেবায় প্রবেশাধিকার; জীবন প্রভাবিত করার সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং নাগরিক জীবনে অংশ নেওয়ার সক্ষমতা বাড়ানো ।
* কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিনিয়োগের উপকারিতা তুলে ধরা। এই বিনিয়োগে কন্যাশিশুর পাশাপাশি তাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও ব্যাপক অর্থে সমাজ উপকৃত হয়।

যৌথভাবে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল(ইউএনএফপিএ) ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ।

কন্যাশিশুর বিকাশের জন্য আমাদের যেসব তথ্য প্রয়োজন

কন্যাশিশুর শিক্ষা: কেন মেয়েরা মাঝপথে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয় এবং কী করলে তারা দীর্ঘ মেয়াদে স্কুলে যাবে?

কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন: কেন এবং কী ধরনের মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হয় কন্যা শিশুরা?

কন্যাশিশুর পুষ্টি: পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ কীভাবে কন্যাশিশুদের এবং ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদের জীবনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে?

কন্যাশিশুর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য: মেয়েদের জীবন এবং তাদের অনাগত সন্তানদের সুবিধা দিতে আমরা কীভাবে কন্যাশিশুদের অকাল গর্ভধারণ করা থেকে বিরত রাখতে পারি?

কিশোরীদের কর্মসংস্থান: শ্রমবাজারে কিশোরী ও নারীদের জন্য কীভাবে আমরা সুযোগ বাড়াতে পারি?

(১২ অক্টোবর, ২০১৬ দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত)

‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম ও আইন শাখার প্রজ্ঞাপন ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা:

৭.৩ গৃহকর্মী নিয়োগের চুক্তি: (১) ১৪ বছর পূর্ণ করেছে তবে ১৮ বছরের কম এরূপ বয়সে গৃহকর্মে নিয়োজিত কিশোর বা কিশোরী কিংবা হালকা কাজের ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত শিশু নিয়োগ করতে হলে আইনানুগ অভিভাবকের সঙ্গে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিয়োগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়োগ প্রদান যুক্তিযুক্ত। তবে মৌখিক চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তা গৃহকর্মী ও নিয়োগকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

বিস্তারিত আলোচনাকালে কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে: (ক) নিয়োগের ধরন, (খ) নিয়োগের তারিখ, (গ) মজুরি, (ঘ) বিশ্রামের সময় ও ছুটি, (ঙ) কাজের ধরন, (চ) গৃহকর্মীর থাকা-খাওয়া, (ছ) গৃহকর্মীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এবং (জ) গৃহকর্মীর বাধ্যবাধকতা;

(২) নিয়োগপত্র কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ উভয় পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, তবে লক্ষ রাখতে হবে যে উক্ত শর্তাবিল যাতে দেশের প্রচলিত আইন ও নীতির পরিপন্থী না হয়;

(৩) ১২ (বার) বছর বয়ঃপ্রাপ্ত কেনো শিশুকে হালকা কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে তার স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য বিপজ্জনক নয় অথবা শিক্ষা গ্রহণকে বিঘ্নিত করবে না তা বিবেচনায় নিতে হবে।

৭.৪. কর্মঘণ্টা, ছুটি, বিশ্রাম ও বিনোদন: প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

৭.৫. প্রসূতিকালীন সুবিধা: সন্তানসম্ভবা গৃহকর্মীকে তার প্রসূতিকালীন ছুটি হিসেবে মোট ১৬ সপ্তাহ (প্রসবের পূর্বে ৪ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ১২ সপ্তাহ অথবা গৃহকর্মীর সুবিধা অনুসারে) সবেতেন মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত ভারী কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মাতৃস্বাস্থ্যের পরিচর্যায় সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গৃহকর্তা সহায়তা করবেন।

৭.৭. চিকিৎসা: অসুস্থ গৃহকর্মীকে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিয়োগকারী নিজ ব্যয়ে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

৭.৯. দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ: কর্মরত অবস্থায় কোনো গৃহকর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে যথাযথ চিকিৎসাসহ দুর্ঘটনা ও ক্ষতির ধরন অনুযায়ী নিয়োগকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

৭.১০. নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:

(ক) কোনোক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর ওপর কোনো রকম হয়রানি ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের ওপর বর্তাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি প্রদান করবে।

(খ) নিয়োগকারী, তার পরিবারের সদস্য বা আগত অতিথিদের দ্বারা কোনো গৃহকর্মী কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন: অশালীন আচরণ, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) গৃহকর্মী নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা যেন দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জারি করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গৃহকর্মীর প্রতি নির্যাতনের প্রতিকারে প্রয়োজনে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সরকারের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।

(ঘ) গৃহকর্মী কর্তৃক দায়েরকৃত যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের মামলা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হবে। যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের গাইড লাইন প্রযোজ্য হবে।

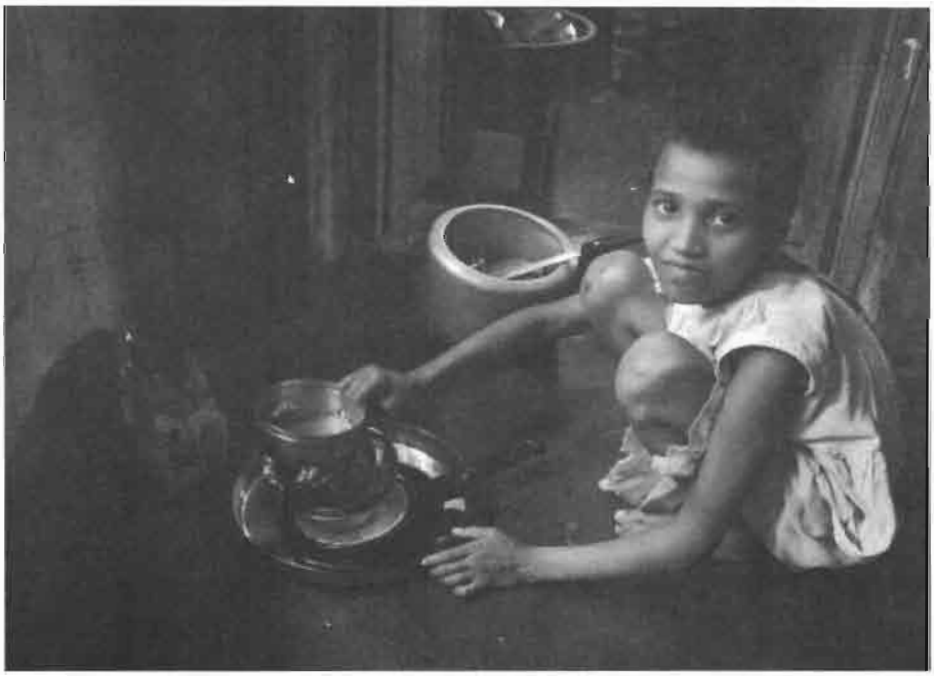

১০. পরিদর্শন কার্যক্রম:

(ক) এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং কোনো ক্ষেত্রে নীতির ব্যতয় ঘটলে পরিদর্শনপূর্বক নীতির আলোকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের জন্য সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় সুশীল সমাজ ও স্থানীয় অধিক্ষেত্রে কর্মরত সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন টিম গঠনের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শন টিমে মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১২. নিয়োগকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) নিয়োগকারী গৃহকর্মীর প্রতি মানবিক আচরণ করবেন। কোনোক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ, দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।

(খ) প্রত্যেক নিয়োগকারী তার গৃহে নিয়োগকৃত গৃহকর্মীর বিষয়ে নীতিতে উল্লিখিত দিকনির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবেন এবং নীতি অনুযায়ী গৃহকর্মীর প্রাপ্য অধিকার ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

(গ) নিয়োগকারী জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত গৃহকর্মীর মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবেন।

(ঘ) নিয়োগকারী অভিভাবকহীন কিশোর-কিশোরী গৃহকর্মীর মজুরি তার সম্মতিক্রমে ব্যাংকে জমা রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যাতে গৃহকর্মী সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

(ঙ) গৃহকর্মী কোনো ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে নিয়োগকারী নিজে কোনো শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করবেন না।

(২৭ অক্টোবর ২০১৬ *দৈনিক প্রথম আলো* থেকে সংগৃহীত)

শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, দেশে যুবক ও মহিলাদের জন্য পৃথক অধিদপ্তর থাকলেও শিশুদের জন্য পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। কারণ দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেই শিশু।

'সংবাদমাধ্যমে শিশু: নীতি-নৈতিকতা ও ধারণা' নিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় প্রতিযোগীতার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ীদের মাধে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন৯বিডিএফ, ম্যানেহমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ইউনিসেফের আয়োজনে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তিনি এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতা চান। মন্ত্রী বলেন, শিশুদের চলাফেরার প্রতি সব সময় অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে শিশু কোনোভাবেই বিপথে না যায়। একজন শিশুর গণমাধ্যম অনুসরণের প্রতিও অভিভাবকদের গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখা উচিত। শিশুটি যে খবর পড়ছে বা যে অনুষ্ঠান দেখছে সেটি কতটুকু ভালো, কতটুকু তার উপযোগী তা বিবেচনা করে শিশুকে সুযোগ দিতে হবে। যাতে করে কোনো খবর পড়ে বা অনুষ্ঠান দেখে শিশু বিপথে না যায়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আকতার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মরতুজা আহমদ, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি ডা. আব্দুর নূর তুষার ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি অ্যাডওয়ার্ড বেগবেডার প্রমুখ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মরতুজা আহমেদ বলেন, এখন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের অনেক প্রসার হয়েছে। অনেক গণমাধ্যম নির্বিঘ্নে কাজ করছে। এই গণমাধ্যম পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় আরো যত্নবান হওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগের পর্বে 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম শিশুবান্ধব নয়'-এই বিষয়ে ছায়া বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে পক্ষে ডা. আব্দুর নূর তুষারের নেতৃত্বে অংশ নেন সাবেক তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম ও বিতার্কিক হাসান মাহমুদ বাবু। বিপক্ষে একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলের নেতৃত্বে দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম ও সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশ গুপ্ত।

গতকালের জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগীতার চূড়ান্ত পর্বে, কলেজ পর্যায়ে সেরা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা কলেজ, স্কুল পর্যায়ে চট্টগ্রামের ডা. খস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও ক্লাব পর্যায়ে সেরা হয়েছে দৃষ্টি চট্টগ্রাম।

কালের কণ্ঠ ০২.১০.২০১৬

দুর্যোগের ফলে ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ অনুপযোগী হয়

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে দুর্যোগপূর্ণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৪৭ শতাংশ শ্রেণিকক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। একই কারণে সৃষ্ট আরও কিছু সমস্যায় ওই সব এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এবং জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর করা এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। ১২ ধরনের দুর্যোগ বিবেচনায় নিয়ে দেশের ১৮টি উপজেলার ১ হাজার ৮০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসা) ওপর গত বছর সমীক্ষাটি করা হয়। আজ মঙ্গলবার ব্যানবেইসে এক অনুষ্ঠানে সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ প্রথম আলো-কে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে শিক্ষা খাতে এ ধরনের সমীক্ষা এটিই প্রথম। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা কতটুকু, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সচেতনতা এবং দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যভান্ডার করতে সমীক্ষাটি করা হয়। এখন এর ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

যে ১৮টি উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলো হলো উপকূলীয় এলাকা ভোলার চরফ্যাশন, কক্সবাজারের মহেশখালী ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর, নদীভাঙন এলাকা সিরাজগঞ্জের চৌহালী, নদী-তীরবর্তী জামালপুরের মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ, প্লাবনভূমি এলাকা যশোরের কেশবপুর ও সাতক্ষীরার তালা, হাওর এলাকা কিশোরগঞ্জের মিঠামইন, বরেন্দ্র এলাকা (খরাপ্রবণতা) চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, পাহাড়ি এলাকা খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা ও কক্সবাজারের পেকুয়া, চর এলাকা কুড়িগ্রামের রাজীবপুর, উপকূলীয় চরাঞ্চল বা দ্বীপ এলাকা নোয়াখালীর হাতিয়া এবং নগর এলাকা রাজধানীর তেজগাঁও ও পল্লবী।

সমীক্ষা বলছে, উপকূলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম এবং সম্পদের ক্ষতি হয়। এ কারণে বেশ কিছুদিন এগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হয়। দুর্যোগের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার রাস্তার ৮০ শতাংশ নষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

সমীক্ষা বলছে, ৪০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবস্থান নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। ৫০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (ফাস্ট এইড বক্স) নেই। ৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেই। ২৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নেই।

দুর্যোগজনিত সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অনিয়মিত থাকে। আর শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির প্রধান কারণ হলো অসুস্থতা।

এসব সমস্যা মোকাবিলার জন্য ওই সব এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কংক্রিটের ভবন না করে এলাকার উপযোগী করা, দুর্যোগ বিবেচনায় ক্লাসের সময়সূচি সমন্বয় করাসহ ২৫টি সুপারিশ করা হয়েছে সমীক্ষায়।

প্রথম আলো ০৪.১০.২০১৫

নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের ঠিকানা হবে জেলখানা

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য আর ব্যবসায়ীদের গাইড-নোট ব্যবসার কারণে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ বিমুখ হচ্ছে। এতে শিক্ষারমান যেমন কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না, তেমনি অনেক শিক্ষার্থী বিপথগামী হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, এই সমস্যা সমাধানে নতুন আইন করা হবে। যারা গাইড-নোট বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের ঠিকানা হবে জেলখানা।

কোচিংবাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার বিধান রেখে এই আইন করা হবে। আগামী সপ্তাহে আইনটি সংসদে উঠবে। গতকাল বৃহস্পতিবার যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা বিভাগের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এএস মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি)

অশোক কুমার বিশ্বাস, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. ওহিদুজ্জামান, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার আব্দুস সামাদ, যশোরের জেলা প্রশাসক ড.হুমায়ুন কবীর, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মজিদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক টিএম জাকির হোসেন প্রমুখ।

আমাদের সময় ০৭.১০.২০১৬

এসএসসি-এইচএসসিতে সৃজনশীলের প্রশ্ন সাতটিই থাকছে: শিক্ষামন্ত্রী

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীলে সাতটি প্রশ্নই থাকছে। সৃজনশীলে ছয়টির স্থলে সাতটি প্রশ্নই থাকছে। সৃজনশীলে ছয়টির স্থলে সাতটি প্রশ্নের মাধ্যমে ১০ নম্বর বাড়িয়ে ও এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়ে সময় বিভাজনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত পরামর্শক কমিটির সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান। নম্বর বিভাজনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছেন।

সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাবুবুর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই, যুক্তি নেই, কোনো কারণও নেই।

এসএসসি, দাখিল, এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার সময় ও নম্বর নতুন করে বিভাজন করে ১৮ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপ-কমিটি। এ বিভাজন অনুযায়ী ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৩০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) উত্তরের জন্য সময় বরাদ্দ করা হয় ৩০ মিনিট। আগে এক্ষেত্রে ৪০টি প্রশ্নের জন্য ৪০ মিনিট ছিল।

অন্যদিকে নতুন নিয়মে সৃজনশীল অংশে ৬টির স্থলে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সময় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট। আগে ৬টি প্রশ্নের জন্য এ সময় ছিল ২ ঘন্টা ১০ মিনিট। এ সিদ্ধান্ত ২০১৭ সাল থেকে পরিবর্তনের ঘোষণা দিই। ২ বছর আগে কেউ এটার (নম্বর পরিবর্তন) বিষয়ে বলেননি। মাসখানেক আগে দেখলাম মফস্বলের দু-একটি স্কুলে দাবি উঠেছে, আরেকটি প্রশ্ন বাড়লে আমাদের সময় তো বাড়বে না। কী করে ওই প্রশ্নের ফুল উত্তর দেব।

আমাদের সময় ১০.১০.২০১৬

প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে

শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য দরকার পরিবার, সমাজ, সুস্থ ও প্রকৃতিসম্মত পরিবেশ। অথচ দেশে শিশুরা বেড়ে উঠেছে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) মিলয়াতনে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বক্তারা। 'শিশুশিক্ষার পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষা' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে ফ্রয়বেল চাইল্ড এডুকেশন স্কুল সোসাইটি ও পবা।

বক্তারা বলেন, দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের সব শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সব স্তরে ভিত্তি সৃষ্টি করে। জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। বক্তারা আরও বলেন, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। বক্তারা বলেন, শিশুর বিকাশের প্রধান স্থান তার পরিবার। পরিবারের সদস্যদের অসদাচরণ, মিথ্যাচার, দুর্নীতিপরায়ণতা, ভারসাম্যহীন ব্যবহার শিশুকে বিপথগামী করে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন দ্বারা শিশুরা প্রভাবিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠী ও শিক্ষক দ্বারা শিশুরা আরও বেশি প্রভাবিত হয়।

সংসদ সদস্য কাজী রোজীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পবার সাধারণ সম্পাদক আবদুস সোবহান। আহছান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এম এম সফিউল্লাহ, পবার চেয়ারম্যান আবু নাসের খান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো ২২.১০.২০১৬

তিন বছরে ঝরে পড়েছে গড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী

মাত্র তিন বছরে লেখাপড় ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ শিক্ষার্থী। এ শিক্ষার্থীরা ২০১৩ সালে প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করত। কিন্তু সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আসতেই ঝরে পড়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে, এর জন্য দায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। ফলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকারের নানা উদ্যোগেও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসছে না। বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানে সরকারকে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন তারা।

আগামী ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে চলতি বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। স্কুল ও মাদ্রাসার প্রায় ২৪ লাখ ১০ হাজার ১৫ শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বছর যারা জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা দেবে, তারাই ২০১৩ সালে পঞ্চম শ্রেণি ও এবতেদায়ি শিক্ষার্থী ছিল। ওইসময় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন। তাদের মধ্য থেকে তিন বছরে লেখাপড়া ছেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৮ জন। হিসাব অনুযায়ী গড়ে ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, এই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয় ছাড়ার অন্যতম কারণ পরিবারের আর্থিক দুর্বলতা। এখন শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে প্রাইভেট কোচিং, গাইড বই সবকিছু মিলিয়ে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে শিক্ষা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এ ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া দিয়ে বেকারত্ব দূর হবে- এমনটিও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে সমস্যাটা অর্থনৈতিক।

তিনি আরো বলেন, কন্যা শিশুরা স্কুল ছাড়ছে বেশি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে। ইভটিজিংয়ের শিকার কন্যাশিশুরা স্কুলবিমুখ। অনগ্রসর এলাকায় এখনো বাল্যবিয়ে পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। এছাড়া পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে উপার্জনের জন্য তাদের ছুটতে হয়। কন্যারা মায়ের সাথে পরিবারের কাজ করে।

শিশুদের স্কুল ছাড়ার সঙ্গে একমত পোষণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিছালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, সরকারের নানামুখী উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে উপবৃত্তি প্রদান, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস চালু, কন্যাশিশুদের বাল্যবিয়েতে নিরুৎসাহিত করা, মিড ডে মিল চালু ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ৬১ টি জেলার পিছিয়ে পড়া ১২৫টি উপজেলার ৫৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ভীতি দূর করতে অতিরিক্ত ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।

আমাদের সময় ২৬.১০.২০১৬

শিক্ষকের মূল্যায়ন, মর্যাদার উন্নয়ন- বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৬

গণসাক্ষরতা অভিযান ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করে আসছে। এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়। ২০১৬ সাল হলো শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কিত ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক সুপারিশমালা প্রণয়নের ৫০ বছর পূর্তি। এবার বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Valuing Teachers, Improving their Status" যার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে "শিক্ষকের মূল্যায়ন, মর্যাদার উন্নয়ন"। প্রতিপাদ্যে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালার গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি ২০৩০ সালের মাধ্যে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান সমন্বয়ক হিসেবে সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও অন্যান্য পেশাজীবী সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কৃতি শিক্ষক সম্বর্ধনা, রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সংবাদপত্রে গণআহ্বান প্রকাশ, র‍্যালী, মানববন্ধন, বাংলা পোষ্টার ডিসপ্লে এবং উপকরণ তৈরি ইত্যাদি কর্মসূচির দিবসটি পালন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৫ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন বিষয়ক জাতীয় উদযাপন কমিটির সমন্বয়ক ও ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট-এর চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চেয়ারম্যান- সিপিডি, নির্বাহী পরিচালক-গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের সহ-সভাপতি, ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান, প্রফেসর এ্যমিরেটাস- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাইস চেয়ার গণসাক্ষরতা অভিযান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন।

বাংলাদেশ লিটারেসি এসোসিয়েশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, গণসাক্ষরতা অভিযান ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ৭-৮ অক্টোবর ২০১৬ দু'দিনব্যাপী ৪র্থ জাতীয় শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করে। স্থানীয় পর্যায়ে ১২টি শিক্ষক সংগঠন, ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ৪০টি সহযোগী সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে এবং পাশাপাশি সারা অক্টোবর মাস জুড়েই অভিযান ও সহযোগী সংগঠনের সমন্বয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। প্রায় ১২,০০০ জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে উল্লেখিত কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি মোবাইল এ্যপ উন্নয়ন, ১,০০০ কপি ফ্যাক্ট শীট পুনঃমুদ্রণ, ইউনেস্কোর প্রকাশিত পোষ্টার এর আলোকে বাংলায় অনুরূপ ১০,০০০ পোষ্টার ছাপানো, সংবাদপত্রে, সময় টিভিতে টক-শো প্রচার ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

শামছুন নাহার কলি

প্রাথমিক শিক্ষাসেবা বিষয়ক রিপোর্ট কার্ড জরিপ- ২০১৬ বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ২০১২ সালে প্রথম রিপোর্ট কার্ড গবেষণা কর্ম করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরপর ২০১৫ সালে অভিযানের সহযোগিতায় ৮টি জেলায় চলমান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর কর্মএলাকায় ২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই গবেষণাটি করা হয় এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর দেশের ২০টি জেলার (অভিযান পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ ও এর বাইরের এলাকা) ১২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিটিজেনস্ রিপোর্ট কার্ড গবেষণা কর্মটি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এই গবেষণার কাজের মাঠকর্ম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার সহযোগী সংগঠন ছাড়াও দেশের ৭টি বিভাগের ১২টি জেলার হতে ১২টি সহযোগী সংগঠন প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে রিপোর্ট কার্ড গবেষণার উদ্দেশ্য, কৌশল, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও প্রস্তুতিমূলক কাজ নিয়ে আলোচনার জন্য ২০ অক্টোবর ২০১৬, বৃহস্পতিবার, বেলা ৩টায় অভিযান কার্যালয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করা হয়। অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মোট-৪২ জন অংশগ্রহণ করেন। পূর্বের গবেষণা অভিজ্ঞতা ও

এবারের গবেষণা কৌশল, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

সান্তনা আইউব

প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা : আমাদের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা' বিষয়ক ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে ও জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে ২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ উপকূলীয় জেলা ভোলায় অনুষ্ঠিত হয় 'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা।

কোস্ট ট্রাস্ট ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে মতবিনিময় সভাটি আয়োজন করে। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: মোবাশ্বির উল্ল্যাহ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: সেলিম উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, ভোলা। সভায় প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব জিয়াউদ্দিন আহমদ, ইন্সট্রাক্টর, পিটিআই, ভোলা। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহাবুব হোসেন আখতার, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকতা ও নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব জনাব এস এম বাহাউদ্দিন। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. মিজানুর রহমান, সমন্বয়কারী, কোস্ট, ট্রাস্ট, ভোলা।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপকূলীয় জেলা ভোলার সামগ্রিক দিক বিবেচনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর যত্ন ও বিকাশে বিভিন্ন সুপারিশ

তুলে ধরেন। সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠায় বিদ্যালয়ের খেলাধুলা, গান, নাচসহ আনন্দদায়ক শিক্ষণ পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নেওয়া, নদী ভাঙ্গন ও চরাঞ্চলের শিশুদের ECCE কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে ও ধরে রাখার জন্য মিড-ডে ও স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক কার্যক্রম সরকারিভাবে গ্রহণ করা, প্রতিটি শিশুর সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ে ভাল আচরণ করা, তাদের মতামতের প্রতি, গুরুত্ব দেওয়া খেলাধুলা করা ও শিশুদের বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ECCE শিক্ষা কেন্দ্র বা শ্রেণিতে সরকারিভাবে পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করা ও শিক্ষকদের স্থানীয় ভিত্তিতে উপকরণ সংগ্রহ করে তা ব্যবহারে মনোযোগী হওয়া, ECCE কার্যক্রম-এর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের দক্ষতা

বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা বিভাগকে বেশি করে প্রশিক্ষণ সুযোগ তৈরি করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র/শ্রেণি পরিচালনায় দুইজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি সরকারিভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মো. মিজানুর রহমান আখন্দ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর সমন্বয় সভা

১৬ ও ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঢাকার গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা । এ সভাতে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা প্রকল্পের ৮ টি সহযোগী সংস্থা ও অভিযানের প্রতিনিধিবৃন্দ। দুই দিন ব্যপী এ সমন্বয় সভার সূচনাতে অভিযানের উপ-পরিচালক কে এম এনামুল হক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমন্বয় সভার উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা প্রকল্পের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন।

"প্রত্যাশা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল সক্ষমতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি "- উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ সমন্বয় সভায় ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় দিকসমূহ তুলে ধরেন ৮টি সংস্থা।

অর্জনসমূহঃ

- প্রচার, প্রচারনা, সভা, সেমিনারের ফলে ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগনের মধ্যে ইতিবাচক ধারনা তৈরী হয়েছে।
- ওয়াচ এলাকা বহির্ভূত কমিউনিটিতে ওয়াচভুক্ত এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
- কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নে অভিভাবকদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- অভিভাবকগণ নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং সন্তানকে সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে শিক্ষকদের পাশাপাশি বাড়িতেও সন্তানের লেখাপড়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।
- ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্কুলে শিক্ষার্থী সমাবেশ, মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হয়;

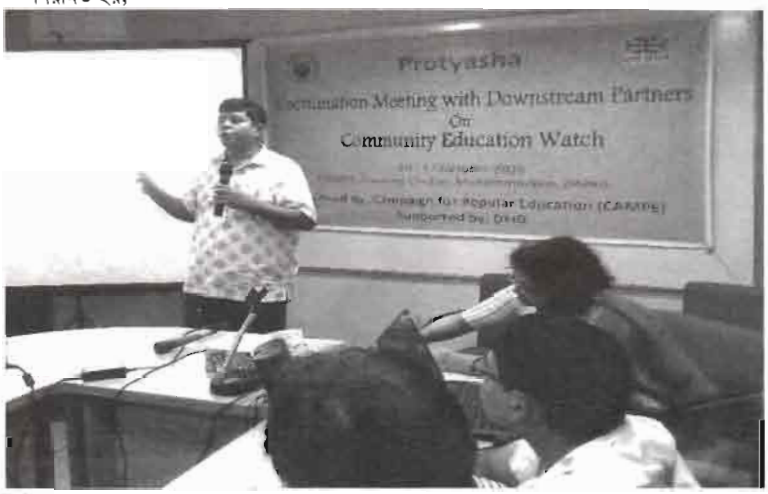

- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- শিক্ষার মান উন্নয়নে ও শিক্ষক সল্পতা দূরীকরণে কয়েকটি সপ্রাবিতে কমিউনিটি এবং এসএমসি'র উদ্যোগে প্যারা শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩২ টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটি স্কোরকার্ড বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- এসএমসি কমিটির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা ও এসএমসি কমিটি সহ অন্যান্য কমিটির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সচ্ছতার অভাব।
- সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধী বান্ধব বিদ্যালয় না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব।

মোঃ আশিক ইকবাল

চাকরি মেলা ২০১৬ আয়োজন বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহায়তায় আগামী ডিসেম্বর ২০১৬-এ একটি চাকুরি মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর ২০১৬ গুলশান সেন্টার পয়েন্ট হলরুমে চাকুরি দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মাননীয় মেয়র জনাব আনিসুল হক। এছাড়াও সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নেসলে বাংলাদেশ, মোহাম্মদী গ্রুপ, প্রাণ-আরএফএল, পলল গ্রুপ, সিঙ্গার বাংলাদেশ, এসিআই মটরস, প্যাসিফিক মটরস্, নিটোল মটরস, টিভিএস-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ল্যাম্বস লিমিটেড, পারটেক্স গ্রুপ-সহ ২০টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মাননীয় মেয়র জনাব আনিসুল হক বলেন, এফবিসিসিআই'র সভাপতি থাকাকালীন সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমি একটি চাকরি মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেখানে আমরা ৭,০০০ তরুণ-তরুণীর চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। আগামী ডিসেম্বর ২০১৬-তে আবার একটি চাকরি মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রত্যাশা করেন যে,এই চাকরি মেলার মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আর এ জন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উর্মিলা সরকার

উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ।

'কর ও ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এর প্রথম মতবিনিময় সভা আগামীকাল রংপুর কমিশনারেটে শুভ সূচনা করবেন এনবিআর চেয়ারম্যান: নভেম্বর ২০১৬'র মধ্যে সকল কর ও ভ্যাট অফিসে পর্যায়ক্রমে চালু হবে ফোরামের কার্যক্রম ।

বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রয়াস ও কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণ। এনবিআর প্রবর্তিত 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' নীতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকল অংশীজনদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। একই সাথে নেওয়া হচ্ছে করদাতাবান্ধব পরিবেশ তৈরির নতুন নতুন কর্মসূচি। এরই অংশ হিসেবে কর প্রদানে সামর্থ্যবান নাগরিকগণকে আয়কর সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য 'কর শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' ও সম্মানিত ব্যবসায়ী এবং সাধারণ নাগরিকদের ভ্যাট প্রদানে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' চালুর উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মানিত করদাতাদের সাথে আয়কর ও ভ্যাট বিভাগ পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় করবেন এবং করদাতাদের কর ও ভ্যাট বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষেত্রে একটি রাজস্ব বান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর সম্মেলন কক্ষে আগামী ৬ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখ প্রথমবারের মতো 'কর ও ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এর যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে কর অঞ্চল রংপুর ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'কর ও ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এর প্রথম সভায় সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর ও ভ্যাট বিভাগের সদস্যবর্গসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, রংপুর অঞ্চলের সুধী সমাজ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

'কর ও ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এর মাধ্যমে সম্মানিত করদাতা ও ব্যবসায়ীগণ যেসব সুবিধা পাবেনঃ

- প্রত্যেক কর কমিশনারের আওতায় 'কর শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এ সাধারণ করদাতার পাশাপাশি ব্যক্তি খাত, প্রতিষ্ঠানিক খাত, সরকারি-বেসরকারি, এনজিও এবং অন্যান্য সংগঠন, সংস্থার করদাতাগণ কর বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাবেন;
- আগামী ৩০ নভেম্বর ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হওয়ায় করদাতাগণ রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা পাবেন;
- স্কুল-কলেজ শিক্ষকরা এসব ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন;
- কর ও ভ্যাট প্রদান ব্যবস্থাপনা আরো সহজতর হবে;
- করদাতা ও ব্যবসায়ীদের কর ও ভ্যাট বিষয়ে সহজ, বোধগম্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কর ও ভ্যাট প্রদানে সহায়ক হবে;
- কর ও ভ্যাট অফিসের সাথে করদাতা ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি উন্নত থাকবে;
- কর ও ভ্যাট ভীতি, হয়রানি বন্ধ হবে, সৃষ্টি হবে করদাতাবান্ধব পরিবেশ;
- মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ যা জুলাই ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত হবে। এ আইনে ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকরা কি কি সুবিধা পাবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন;
- তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিনিয়োগ, শিল্প, ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশে তৈরিতে সহায়ক হবে;
- ভ্যাট নিবন্ধন থেকে রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ, কর ফেরতসহ যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়ে অবহিত হতে পারবেন; এবং
- সকল কর ও ভ্যাট অফিসে সারাবছর উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় থাকবে।

এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান প্রধান অতিথির দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বলেন, "রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি দেশে শিল্পায়ন, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সম্মানিত করদাতাগণ আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সম্মানিত করদাতাদের সাথে বিভিন্ন সময় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, রাজস্ব সংলাপ, মতবিনিময় সভা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে কর ও ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি আরো সহজ করার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আয়কর রিটার্ন জমাদান, ভ্যাট নিবন্ধনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কর ও ভ্যাট প্রদান বিষয়টি যাতে আরো সহজতর হয়, এজন্য তাঁদের চাহিদা ও মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমরা 'কর ও ভ্যাট শিক্ষণ সহায়ক ফোরাম' এর শুভ সূচনা করলাম।

তিনি আরো বলেন, এসব ফোরামের প্রথম মতবিনিময় সভা রংপুর কর ও ভ্যাট কার্যালয় থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। নভেম্বরের মধ্যে সকল কর ও ভ্যাট অফিসে এসব ফোরামের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চালু হবে। রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষেত্রে একটি রাজস্ব বান্ধব সংস্কৃতি চালুর লক্ষ্যে এসব ফোরাম থেকে সম্মানিত করদাতা ও ব্যবসায়ীগণ আয়কর ও ভ্যাট সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ রাজস্ব কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সরাসরি ধারণা পেতে সক্ষম হবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ মুমেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৬৯ কার্তিক ১৪২৩ অক্টোবর ২০১৬

সম্পাদক

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিধি অতিক্রম করে আমরা এখন প্রবেশ করেছি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কালসীমার মধ্যে। এটা একটা আত্মশ্লাঘায় বিষয় যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অথবা জাতিসংঘ যেমনভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিশানা ঠিক করে দিয়েছিল, সময়সীমা শেষ হবার আগেই আমরা তা ছুঁয়ে ফেলেছি। কিন্তু চিত্রটা যে সর্বসুন্দর তা ঠিক নয়, দেশের শিক্ষাচিত্রটাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখার দরকার নেই, খালি চোখে দেখলেই বোঝা যাবে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রতিবেশী দূরত্বে কত শিশু খেলছে আদুল গায়ে, অথচ দেশে যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলিত আছে তার আলোকে এসব শিশুদের স্কুলে থাকার কথা। লেগুনা নামে যে জনপ্রিয় বাহন ঢাকার হেথায়-হোথায় যাবার জন্য আমরা ব্যবহার করি, তার অনেক সহকারী এমনকি চালক আছে যাদের স্কুলে থাকার কথা। একটু দূরে গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছালে চিত্রটা আরো করুণ হয়ে দেখা দিতে পারে। পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলে বা হাওর-বাওর এলাকায় অধিবাসী পরিবারের শিশুরা লেখা-পড়ার অনুশীলন থেকে অনেক দূরে। অবশ্য একথাও মানতে হবে যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলের একটা মধুর দৃশ্য হল মেয়েরা লাইন বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে অথবা স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে। মোদ্দা কথাটা হল, শতভাগ অভিগম্যতা শুধু নয়, প্রাথমিক সমাপন বিষয়ে যে লক্ষ্যের কথা একবিংশ শতককে অভিবাদন জানানোর সন্ধিক্ষণে আমরা ঠিক করেছিলাম, তার অর্জন এখনো আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এখন যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হচ্ছে, তার ৪-সংখ্যক লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতার কথা বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন অভিলক্ষ্যের (Target) যে উল্লেখ রয়েছে এই বৈশ্বিক দলিলে তা পূরণ করার জন্য আমাদের হাতে আছে আরো বছর পনেরো। কিন্তু ইউনেস্কোর যে বৈশ্বিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আমাদের অর্জনের বা কর্মপন্থা বাস্তবায়নের গতি যদি এই সমকালের মত থাকে, তাহলে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে ওই বিশিষ্ট ৪-সংখ্যক লক্ষ্য অর্জনে সময় লাগতে পারে ২০৫৯ সাল পর্যন্ত এবং গরিব দেশগুলিতে এটার বাস্তবায়ন দেখতে আমাদের ২০৮৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষাপ্রাপ্তিতে বৈষম্যের দ্বিবিধ চরিত্র আছে। দেখা যাচ্ছে, ধনী দেশগুলি গরিব দেশগুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে। সেটাই স্বাভাবিক। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির জনগণ হয়ত বুঝতেই পারে না যে, সাব-সাহারান অঞ্চল বা দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় শিক্ষাদানের বা শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রকৃত অবস্থা কিরকম। এই বিরাট বৈষম্য পূরণ করতে ধনী দেশগুলিকে প্রতিশ্রুত অর্থায়নের বিষয়ে সৎ থাকতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বহু মানুষকে যে ভিটেমাটি ছেড়ে বাধ্যতামূলক অভিবাসী হতে হচ্ছে, তার দায় ধনী দেশগুলিকে গ্রহণ করতেই হবে। একই সঙ্গে দেশের মধ্যে যে বৈষম্যের সমস্যা রয়েছে, ঢাকার জনসংখ্যায় নাকি প্রতিদিন গ্রাম থেকে ১৭০০ ব্যক্তি যুক্ত হচ্ছে, তার সমাধানে দেশীয় সরকারের তৎপর হতে হবে। এই ঘরোয়া অভিবাসনের সঙ্গে শিক্ষায় অগ্রগতির প্রশ্ন জড়িত।

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org

Facebook page: https://www.facebook.com/campebd, Twitter: https://twitter.com/campebd

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC8lBbGUuYku02mV12r_3lsg